হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
মাওলানা জালালুদ্দীন সুয়ূতী

হযরত আয়েশা

রাযিয়াল্লাহু আনহা

মূল ঃ

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ

মাওলানা জালালুদ্দীন সুয়ূতী

ভাষান্তর ঃ

মুহাম্মদ হাসান রহমতী

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৭৭

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২১
আশ্বিন	১৪০৭
অক্টোবর	২০০০

বিনিময় ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

عائشه رضـ -এর বাংলা অনুবাদ

HAZRAT AISHA RADIALLAHU ANHA by ABBAS MAHMUD AL AKKAD & MAWLANA JALALUDDIN SOUTI. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 80.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. আরবদের দৃষ্টিতে নারী ৯
২. ইসলাম এবং নারী সমাজ ১৭
৩. অমর নারী ২৪
৪. আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ৩৪
৫. বৈবাহিক জীবন ৫২
৬. অপবাদের ঘটনা ৭৯
৭. বৈধব্য কাল ৯৯
৮. রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১০৪
৯. নারীর অধিকার ১২৬
১০. আইনুল ইসাবা ১৩৩
০ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার শ্রেষ্ঠত্ব ১৩৫
০ পবিত্রতা ১৩৭
০ সালাত ১৩৮
০ জানাযা ১৪০
০ রোযা ১৪৪
০ হজ্জ ১৪৬
০ ক্রয়-বিক্রয় ১৫০
০ বিবাহ ১৫১
০ সমগ্র ১৫৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

যে কয়জন গৌরবজনক মহীয়সী মহিলার উল্লেখ ব্যতিরেকে ইসলামের ইতিহাস পূর্ণ হতে পারে না হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাদের অন্যতমা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী। তাকওয়া ও পবিত্রতার উচ্চমর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন। জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না। ইলমে দীনের ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিলো পুরোপুরি। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন তিনি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবক্ষেণ করেছিলেন। আর এ কারণেই সীরাত গ্রন্থসমূহ, হাদীসের কিতাব ও সাহাবা কাহিনীতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নাম যে সুনিপুণভাবে উল্লিখিত হচ্ছে অন্য কোনো মহিলার নাম সেভাবে আসে না।

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ হযরত আয়েশার এ জীবনী গ্রন্থটি সাধারণ প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে জীবন চরিতের আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ পুস্তকে তিনি কেবল তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব ঘটনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। তার প্রেক্ষাপটের ওপর সবিস্তার আলোকপাতও করেছেন। এ পুস্তকের আরেকটি বড় সৌন্দর্য হচ্ছে এই যে, এতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দীনী ও ইল্‌মী মর্যাদা প্রকাশ করার সাথে সাথে তাঁকে একজন আদর্শ নারী রূপেও পেশ করা হয়েছে। এদিক থেকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ জীবনী পুস্তকটি এক অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

পুস্তকটির শেষ দিকে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর একটি মূল্যবান পুস্তিকা "আইনুল ইসাবা ফীমা ইস্তাদরাকাতহু সাইয়েদাতু আয়েশা আলাস সাহাবা"—(যেসব মাসআলায় অন্য সাহাবাদের সাথে হযরত আয়েশার মতভেদ ছিলো, সেগুলোর সঠিক সিদ্ধান্ত)-এর তরজমাও পরিশিষ্ট হিসাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। মূল আরবী পুস্তিকাটি আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর 'সীরাতে আয়েশা' নামক পুস্তকের শেষে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর এর পূর্বে পুস্তক আকারে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকেও প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সংক্ষিপ্ত অথচ

www.pathagar.com

সারগর্ভ পুস্তিকায় সেইসব ইল্‌মী ও ফিক্‌হী মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলোতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্য সাহাবার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং সাথে সাথে দ্বিমত পোষণের কারণও বর্ণনা করেছেন। এটি পাঠ করার পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিস্ময়কর ইজতিহাদী দক্ষতা স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

ইলহাদ ও অধর্মের এ যুগে মুসলিম জনগণকে তাদের পূর্বসূরীদের কারনামা সম্পর্কে পরিচিত করানোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যাতে তারা তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে ধর্মের মূল প্রাণশক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, এ পুস্তকটিও যেনো এ উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত হয় এবং আমাদের নারী সমাজও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পদাংক অনুসরণ করে শিক্ষাগত, সাহিত্যগত, চরিত্রগত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে একে অন্যের ওপর জয়লাভ করার প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেন।

বইটি বঙ্গানুবাদ করে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি পাঠক-পাঠিকাদের উপর অবিচার না করে থাকি, তাহলে সঙ্গতভাবেই তারা আমার জন্য আন্তরিক দুআ করবেন—এই আশা করি।

হাসান রহমতী
২২-৫-৯৯

www.pathagar.com

আরবদের দৃষ্টিতে নারী

নারী সম্পর্কে আরবদের ধ্যান-ধারণা ছিলো অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক। প্রাক ইসলামী যুগে তারা কোনো শরীয়াতের অনুসারী ও চরিত্র-নীতির পাবন্দ ছিলো না। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সাময়িক প্রয়োজন মাফিক তাদের ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তন হতো। নারী সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্য জাতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও বিধি-বিধান তৈরি করেছিলো। সেগুলো তাদের প্রতিনিয়ত মেনে চলতে হতো। কিন্তু আরবরা না কোনো রীতি-নীতির অনুসারী ছিলো, না তাদের ধ্যান-ধারণাকে অন্য কোনো জাতির ধ্যান-ধারণার ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারতো।

পুরাকালে নারীকে পাপের প্রতিমূর্তি মনে করা হতো। অধিকাংশ ধর্মের মতে, এ নারী জাতিই মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে বের করে এনে গোটা মানবজাতিকে বিপদ-মুসীবত ও সংকটের এক চোরাবালিতে নিক্ষেপ করেছে। যার থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীকে কেবল পাপের নয়, বরং পংকিলতারও প্রতিমূর্তি মনে করা হতো। কেননা, মানুষ মনে করতো যে, নারী জাতিই কেবল মানুষের মধ্যে কামভাব জাগ্রত ও প্রজ্বলিত করে থাকে এবং মানুষের দ্বারা যে শয়তানী ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পায়, তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব নারীর ওপরই বর্তায়।

কিন্তু আরবরা এ দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তারা কখনো অন্য জাতিসমূহের অনুসরণে নারীকে পাপ-পংকিলতার প্রতিমূর্তি প্রতিপন্ন করা এবং নিছক এ কারণে তাদের সাথে ঘৃণাব্যঞ্জক আচরণ করার প্রয়াস পায়নি।

রুশদের মতো আরবরা নারী সম্পর্কে কোনো বিশেষ সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রণয়ন করেনি। রোমকরা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ও শাসক ছিলো। এ বিরাট সাম্রাজ্যের অধিবাসী ও তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা তাদের পক্ষে আবশ্যক ছিলো। তাই মৌলিক অধিকার প্রমাণ করার সময় তারা নারীকে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করলো, যারা সর্বতোভাবে দুর্বল এবং সর্বদা অন্যদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। নারীর সত্তার সাথে তাদের কোনো বৈরিতা ছিলো না। কিন্তু তাদের সৃষ্টিগত দুর্বলতা তাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দুর্বল ও অভাবীদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, নারীর সাথেও সেরূপ করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু আরবরা সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো, যা তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত ছিলো এবং যার মধ্যে অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করা হতো। তাদের স্বভাব ছিলো যাযাবরী। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের পরিবর্তে তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলতো। অবস্থা অনুযায়ী তাদের প্রবৃত্তিও বিভিন্ন রূপ ধারণ করতো। কখনো তারা নারীর সাথে ক্রীতদাসীর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করতো এবং কখনো আবার তাদেরকে এতই সম্মান প্রদর্শন করতো যে, পুত্রের সম্পর্ক পিতার সাথে না করে মাতার সাথে স্থাপন করতো। তাই সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থে আমরা এমন কিছু নাম দেখতে পাই, যাদের সম্পর্ক তাদের পিতার স্থলে মাতার সাথে স্থাপন করা হয়েছে।

আরব জাতির ইতিহাসে আমরা এমন কিছু ঘটনাও দেখতে পাই যে, কোনো ব্যক্তি নিছক নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তার শত্রুদের থেকে এরূপ ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে যে, তা পাঠ করলে শরীর শিউরে ওঠে। বানু বকর ও বানু তাগলাবের মধ্যকার লড়াই তার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। এ লড়াই চল্লিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। অথচ এটি শুরু হয়েছিলো নিছক একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বনু বকরের বাসূস নাম্নী জনৈকা মহিলার ঘরে একজন মেহমান আসে। বানু তাগলাবের কুলায়ব নামক গোত্রপতি কোনো কারণে তার উটনীর পা কেটে ফেললো। এ অবস্থা দেখে বাসূসের ভাগিনা ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলো। সে বাসূসের সামনে শপথ করে বললো যে, তোমার মেহমানের উটনীকে যে আহত করেছে, তাকে হত্যা না করে আমি ছাড়বো না। যেরূপ কথা সেরূপ কাজ। সে তার শপথ পূর্ণ করলো। তার খালার মেহমানের উটনীকে আহত করা কিংবা অন্য কথায় তার খালার মান-সম্মানের ওপর হামলা করার জন্য কুলায়বকে সে হত্যা করলো।

কিন্তু এরই সাথে এটাও কারো অজানা নয় যে, এ আরবরাই তাদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য কিংবা অতি দারিদ্র্যবশত তাদের কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দিতো। ইসলাম এসে সম্পূর্ণ বন্ধ করে না দেয়া পর্যন্ত এ নির্মম রীতি অব্যাহত ছিলো।[১]

১. মান-সম্মান রক্ষার জন্য কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হচ্ছে—কায়স ইবনে আসিস। এ ব্যক্তি বানু তামীমের সরদার ছিলো। কোনো এক যুদ্ধের সময় তার শত্রুপক্ষ তার কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। কায়েস তাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বয়ং তার কন্যাই ফিরে আসতে অস্বীকার করে। তখন সে শপথ করলো যে, তার ঘরে যে কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, তাকে সে জীবন্ত কবর দিবে। বাহ্‌তারী নামক এক খ্যাতনামা কবি তাঁর এক কবিতায় এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

এসব ঘটনা দেখে বাহ্যত মনে হয়, আরবরা পরস্পর বিরোধী স্বভাবের লোক ছিলো। একদিকে তারা নারীর মান-সম্মান রক্ষার জন্য স্বীয় শত্রুদের কাছ থেকে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করতেও পিছপা হতো না, অপরদিকে নারীদের প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে তারা তাদের কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। কিন্তু ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, তাদের স্বভাবের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ছিলো না। বরং দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন তারা এরূপ কাণ্ড করতে বাধ্য হয়েছিলো।

আরব উপদ্বীপ মূলত একটি বিরাট মরুভূমি। যেখানে হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত গাছপালা ও পানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আরব গোত্রসমূহ যেখানে কোনো জলাশয় ও মরূদ্যান দেখতো, সেখানে ছাউনি ফেলতো। যেহেতু জলাশয় খুব কম ছিলো এবং জনসংখ্যা ছিলো বেশী, তাই প্রত্যেক গোত্র চেষ্টা করতো অন্য গোত্রের ওপর হামলা করে তাদের জলাশয়টি করতলগত করতে। কিন্তু জলাশয়ের অধিকারী গোত্রটিও সহজে পরাভব মেনে নিতে প্রস্তুত হতো না। স্থান ছেড়ে দেয়ার অর্থ ছিলো নিজেদেরকে মৃত্যু ও ধ্বংসের হাতে ন্যস্ত করা। আর এ কারণেই প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ অত্যধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হতো এবং তারা তাদের নিজেদের ও নিজেদের নারীদের মান-সম্ভ্রমকে প্রাণের চেয়েও বেশী মনে করতো। তারা সঙ্গতভাবেই মনে রাখতো যে, আজ যদি আমরা আমাদের ও আমাদের

"তুমি কি সেই ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করছো, যে কখনো তলোয়ার চালায়নি এবং কখনো নেযাও হাতে নেয়নি। এর চেয়ে অধিক অক্ষমতা ও দুর্বলতার নিদর্শন কি হবে যে, পুরুষ নারীর জন্য কাঁদবে। বানু তামীমের সরদার কায়স ইবনে আসিম তার কন্যাদেরকে উপোস ও দারিদ্র্যের জন্য জীবন্ত কবর দেয়নি, বরং স্বীয় মান-সম্মান রক্ষার জন্য এরূপ করেছে।

যেখানে আরবদের মধ্যে এরূপ লোকের অভাব ছিলো না, যারা তাদের মান-সম্মানের জন্য কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দিতো, সেখানে এরূপ লোকও ছিলো, যারা উপবাস, দারিদ্র্য ও অধিক সন্তানের জন্য কন্যাদের সাথে এরূপ নির্মম আচরণ করতো। তার প্রমাণ হচ্ছে—সা'সাআহ ইবনে নাজিয়া। তিনি নবজাত কন্যাদেরকে তাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে কিনে নিতেন এবং স্বয়ং নিজে তাদেরকে লালন-পালন করতেন। কন্যাদের মাতা-পিতারা খুব আনন্দের সাথে তাদেরকে সা'সাআর কাছে বিক্রি করে দিতো। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এভাবে ২৮০টি কন্যা ক্রয় করে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আরবরা যদি নিছক মান-সম্মান রক্ষার জন্য কন্যাদেরকে হত্যা করতো, তবে তারা কখনো তাদেরকে সা'সাআর কাছে বিক্রি করতো না। কেননা, স্বীয় মান-সম্মান রক্ষাকারীদের কাছে এর চেয়ে অধিক লজ্জার কারণ আর কি হতে পারে যে, তারা তাদের কন্যাদেরকে অন্য লোকের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে।

কুরআন কারীমও এ বিষয়টি সমর্থন করেছে যে, আরবরা তাদের কন্যাদেরকে দারিদ্রের কারণেও হত্যা করতো। আল্লাহ পাক বলছেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ "তোমরা তোমাদের সন্তানাদিকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না।"

www.pathagar.com

নারীদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে ব্যর্থ হই, তবে আগামীকাল আমাদের গোত্র রক্ষা করতেও ব্যর্থ হবো। আর আমাদের শত্রুরা আমাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমাদের ধ্বংসকে কাছে টেনে আনবে।

যেখানে প্রতিনিয়ত মান-মম্ভ্রম রক্ষার জন্য কোমর বেঁধে থাকার কারণ ছিলো খাদ্যাভাব ও অভাব-অনটন, সেখানে কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার বড় কারণও ছিলো এটি। তারা মনে করতো যে, যদি শত্রুরা আমাদের ওপর হামলা করে, তবে হয়তো আমরা আমাদের নারীদের সতীত্ব ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারবো না এবং তারা আমাদের শত্রুদের হস্তগত হবে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার উত্তম পথ তারা এটাই ভেবেছে যে, কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই তাকে জীবন্ত কবর দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের মান-সম্ভ্রমের ওপর কোনো আঘাত না আসতে পারে।

আরবদের খাদ্যান্বেষণ ব্যপদেশে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো, তার ফলশ্রুতি হিসাবে তাদের নারীরা বিকলাঙ্গ হয়ে না থেকে গোত্র ও পরিবারের জন্য কার্যকর অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে শুরু করে। তারা জঙ্গলে গিয়ে উট ও বকরী চরাতো, গবাদি পশুর দুধ দোহন করতো, পশম পাকাতো, তাঁবু বানাতো, আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধতো, এমনকি গর্ভ ও প্রসবের সময় নিজের চিকিৎসাও নিজেই করতো। এসব কাজে তারা এতই দক্ষতা অর্জন করেছিলো যে, এ কালের বহু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জাতির নারীরাও তাদের সামনে নগণ্য মনে হয়। এতো পরিশ্রমের দরুন তাদের স্বাস্থ্যই শুধু ভালো থাকতো না, বরং সন্তানও স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী জন্মগ্রহণ করতো। এ স্বাস্থ্যবান সন্তান বড় হয়ে গোত্র ও পরিবারের জন্য সম্মান, গর্ব ও সুখ্যাতির কারণ হতো।

বেদুঈন গোত্রসমূহে নারীদের সাথে উপরোক্ত ব্যবহার করা হলেও ভদ্র ও শহুরে পরিবারগুলো ও গোত্রপতিগণ সাধারণত নারীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তারা নারীর প্রতি তাদের প্রকৃত প্রাপ্য মর্যাদা ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করতেন।

সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে জ্ঞান-বুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হয়, স্বভাব-প্রকৃতি থেকে উগ্রভাব দূর হয়ে শান্ত-শিষ্টতা সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক মিলমিশ ও মায়া-মমতার অনুভূতি পরিস্ফুট হয়। এসব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের প্রকাশ পারিবারিক জীবন থেকেই আরম্ভ হয়। কেননা, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকেই অনুমিত হয় যে, তাদের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি কতটুকু বিদ্যমান।

www.pathagar.com

সভ্য-ভব্য লোকদের মতো গোত্রপতিগণ তাদের কন্যাদের জন্য উঁচু দরের ভদ্রশিষ্ট বর তালাশ করতেন। হীনমনা ও নিম্ন শ্রেণীর জওয়ানদেরকে কোনো গোত্রপতি তার জামাতা বানানো পসন্দ করতেন না। আর এ কারণেই আরবের গোত্রপতিগণ তাদের কন্যাদের বর নির্বাচন স্বয়ং নিজেরাই করতেন। আর এ নির্বাচনে কন্যাদেরকেও অবশ্যই শরীক করতেন। এ সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে এই যে, হারিস ইবনে আওফ মুররী নামক জনৈক ব্যক্তি তায় গোত্রের সরদার আওস ইবনে হারিসা তাঈর কাছে স্বীয় পয়গাম নিয়ে আসেন। আওস তার স্ত্রীর কাছে এলেন এবং সর্বপ্রথম তার বড় মেয়েকে ডেকে বললেন ঃ হে কন্যা ! আরবের এক শ্রেষ্ঠ সরদার হারিস ইবনে আওফ আমার কাছে তার পয়গাম নিয়ে এসেছেন। আমার ইচ্ছা তোমাকে তার কাছে বিয়ে দেয়া। এ সম্পর্কে তোমার মতামত কি ? কন্যা জবাব দিলো ঃ "এ বিয়েতে আমার সম্মতি নেই।' পিতা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেনো ? সে বললো ঃ 'আমার চেহারা-সুরাতও ভালো নয় এবং স্বভাবের মধ্যেও রয়েছে উগ্রতা। তিনি তো আমার চাচাত ভাই নন যে, রেশতাদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর তিনি আপনার প্রতিবেশীও নন যে, আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। আমি আশংকা করছি, আমার কোনো আচরণ তার অপসন্দ হলে তিনি ডান-বাম বিবেচনা না করে চট করে আমাকে তালাক দিয়ে দিবেন। আর তার সব দায়-দায়িত্ব বর্তাবে আমার ওপর ও আপনার ওপর।"

একথা শুনে তিনি তাকে বিদায় দিলেন এবং মেঝো মেয়েকে ডেকে তার মতামত জানতে চাইলেন। মেঝো মেয়ে জবাব দিলো ঃ "আমার কোনো গুণ ও শিষ্টতা নেই। তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেই তালাক দিয়ে দেবেন।"

এরপর তিনি তার ছোট মেয়ে বাহসিয়াকে ডাকেন এবং তার কাছেও তার মতামত জানতে চান। সে বললো ঃ "আব্বাজান ! আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দিন। আমি সুন্দরী, ঘরকন্না সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী এবং কুল-বংশ ও আভিজাত্যের দিক দিয়েও কারো থেকে কম নই। তিনি যদি আমাকে তালাক দেন, তবে তার নিজেরই ক্ষতি করবেন।

যা হোক, আওস তার এ কন্যাটিকে হারিসের কাছে বিয়ে দিলেন। হারিস তার নববধূকে নিয়ে স্বীয় গোত্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সে সময় আবাস ও যাবিয়ান গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো। তাই গৃহে পৌঁছেই বাহসিয়া হারিসকে বললো, এ দুই গোত্রের মধ্যে সন্ধি না করানো পর্যন্ত তুমি বাসর গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। হারিসকে তার নবপরিণীতার এ দাবী মানতে

www.pathagar.com

হলো। এভাবে বাহসিয়ার বুদ্ধিমত্তার দরুন দুই গোত্রের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেলো এবং এ উভয় গোত্র এক বিরাট রক্তপাত থেকে বেঁচে গেলো।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উকবা সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তাঁকে কুরায়শের দু'জন বড় সরদার পয়গাম দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে তাদের অবস্থা জানতে চাইলে পিতা বললেন, প্রথম ব্যক্তি ধনাঢ্য। তুমি যদি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং স্ত্রীর কর্তব্য উত্তমভাবে প্রতিপালন করো, তবে তিনিও তোমাকে ভালোভাবে রাখবেন। কিন্তু তার সাথে তোমার ব্যবহার যদি ভালো না হয়, তবে তিনিও তোমার প্রতি রূঢ় হবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি উন্নত কুল-বংশের অধিকারী। বুদ্ধিমান, জাতীয় মর্যাদাবোধ তার মধ্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ এবং স্বীয় পরিজনবর্গের সাথে তার ব্যবহার খুব ভালো।

হিন্দা বললো, দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার মাপকাঠিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ। আর যেহেতু আমিও এসব গুণে গুণান্বিতা, তাই তার কাছেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন।

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিয়ের পূর্বে স্বীয় কন্যাদের সাথে পরামর্শ করা আরব গোত্রপতিদের বৈশিষ্ট্য ছিলো। খুব কম গোত্রপতিই এ নিয়ম উপেক্ষা করে নিজের মত মতো তার কন্যা বিয়ে দিতেন।

কোনো জাতির বিশেষ স্বভাব-চরিত্র থেকে সাধারণত তার প্রতিটি সদস্যই অংশ পেয়ে থাকে। কেউ কম, কেউ বেশী। অবশ্য জাতির একটি অংশের মধ্যে এসব চরিত্র পুরোপুরি বিদ্যমান থাকে এবং দেখে মনে হয় যেনো এ চরিত্রগুলো কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত। অন্যদের মধ্যে তাদের ছায়া পড়েছে মাত্র।

বানু তামীম ছিলো আরবের একটি সম্মানিত গোত্র। আরবরা যেসব উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলো বানু তামীমের মধ্যে তা পুরোপুরিই পাওয়া যেতো। সভ্যতা-ভব্যতা, বীরত্ব-বাহাদুরী, ভদ্রতা-শিষ্টতা মোটকথা এমন কোনো উত্তম চরিত্র ছিলো না, যার মধ্যে এ গোত্রের অংশ অন্যান্য গোত্র অপেক্ষা অধিক নয়।

এ গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিত পরিবার ছিলো হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর। গোত্রের নেতৃত্ব এ পরিবারের সদস্যদেরই হাতে ছিলো। সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে এ পরিবার কুরায়শের শীর্ষ পরিবারগুলোর অন্যতম। সুতরাং যেসব বৈশিষ্ট্য আরবদের মধ্যে বর্তমান ছিলো, তার সবগুলোই পূর্ণ মাত্রায় এ পরিবারের মধ্যেও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক ছিলো। আর বাস্তবতাও ছিলো তদ্রূপ।

www.pathagar.com

এ পরিবারটি ছিলো অতিশয় কোমল হৃদয়, কোমল চরিত্র ও বিনীতচিত্ত। তাই তারা তাদের সহধর্মিণী ও কন্যাদের সাথে সৌজন্য ও মায়া-মমতা প্রদর্শনেও ছিলো অদ্বিতীয়।

আবু বকরের পরিবারের নারীদের সম্পর্কে আরবে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাগ্যবতী। কেননা, তাদের স্বামীরা তাদেরকে যেভাবে আরামে রাখে, অন্য কোনো পরিবার সে রকম রাখে না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্রদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সম্পর্কে সাহিত্য বইতে তার স্ত্রীর সাথে পরম ভালোবাসার কাহিনী বর্ণিত হয়নি।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ। তার বিয়ে হয়েছিলো আতিকা বিনতে যায়দ আদাদিয়ার সাথে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে এতোই ভালোবাসতেন যে, তার জন্য তিনি দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন। আবদুল্লাহ বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে, কিন্তু তার মনে স্থিরতা এলো না। স্ত্রীর বিচ্ছেদে তিনি সবসময় বিরহের কবিতা পাঠ করতেন। সেসব কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো এরূপ ঃ

"হে আতিকা ! আকাশে যতদিন চন্দ্র-সূর্য উদিত হবে, আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। হে আতিকা ! আমার মন দিবানিশি তোমার জন্য উতালা থাকে। আমি সর্বদা তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকি। আমি যেদিন তোমাকে তালাক দিয়েছিলাম, সেরূপ অন্ধকার দিন আমি আর দেখিনি। হায় ! দুনিয়ার তামাম বস্তু যদি আমি হারাতাম কিন্তু তোমার সান্নিধ্য না হারাতাম ! এ বিরহ সবকিছুর বিরহ অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক।"

আবদুল্লাহর ভাই আবদুর রহমানকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব লায়লা বিনতে জুদী নাম্নী একটি দাসী দান করেছিলেন। দাসীটি ছিলো অতি সুন্দরী। আবদুল্লাহর মতো আবদুর রহমানও তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। তার এ অবস্থা দেখে তার ভগ্নী হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার তাকে তিরস্কারও করেছিলেন।

বানু তামীম গোত্রে নারীদের সাথে যে সু-আচরণ করা হতো, তাতেই বুঝা যায় আরবের ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় গোত্রগুলোর মধ্যে নারীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হতো। ঐ গোত্রে নারীর মর্যাদা যেহেতু অনেক উন্নত ছিলো, তাই তাদের মান-

www.pathagar.com

সম্ভ্রম রক্ষার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। ইবনে সিরীন বলেন, এ উম্মতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সবচেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবদুল্লাহ আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবু বকরের অনুপস্থিতিতে কতিপয় লোক কোনো প্রয়োজনে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েসের কাছে আসে। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারটি অপসন্দ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে অন্যদের ঘরে যেতে নিষেধ করে দিলেন।

বানু তামীমের জনৈকা মহিলা আয়েশা বিনতে তালহা সম্পর্কে উমার বিন আবী রবীআ কয়েকটি কবিতা রচনা করলো। তখন ঐ গোত্রের লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বললো, এরপর যদি সে কোনো দিন এ ধরনের কবিতা রচনা করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। তখন সে শপথ করে বললো, ভবিষ্যতে এরূপ আর কখনো করবে না।

বানু তামীমের এ পরিবারেই সেই সুবিখ্যাত মহীয়সী নারীও জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কেবল তাঁর পরিবার ও গোত্রের নামই উজ্জ্বল করেননি, বরং বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে তাঁর স্বজাতির মর্যাদাও সমুন্নত করেছেন। আর এ নারীই তিনি, যিনি হচ্ছেন এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়—অর্থাৎ হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহা।

www.pathagar.com

ইসলাম এবং নারী সমাজ

ইসলাম এসে নৈতিক চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এক উন্নত মাপকাঠি প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা আজ পর্যন্ত বিশ্ব জাতিসমূহের জন্য আলোক স্তম্ভ স্বরূপ। নারীর সাথে সু-আচরণ ও স্নেহ-মমতার কথাই ধরুন না কেনো। জাহেলিয়াত যুগে সাধারণত নারীর কোনো মান-মর্যাদাই ছিলো না। যাযাবর গোত্রগুলো তো নারীর কোনো মর্যাদাই বোঝতো না। অবশ্য সম্ভ্রান্ত শহরে পরিবারগুলোতে তারা কিছুটা মর্যাদা পেতো। কিন্তু ইসলাম এসে তাদেরকে সব রকম অধিকার দান করে এবং এসব অধিকার কেবল উচ্চ পরিবারের নারীদের জন্যই নির্ধারণ করেনি, বরং সর্বশ্রেণীর নারীদের জন্য ব্যাপক করে দিয়েছে। এসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার দরুন একজন সাধারণ মুসলিম নারীর মর্যাদা জাহেলিয়াত যুগের সম্ভ্রান্ততম পরিবারের নারী অপেক্ষাও উন্নত হয়ে গেছে। ইসলাম নারীকে ইতর প্রাণী মনে করে না। সে তার আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে অবদমিত করার পক্ষপাতী নয়। বরং তার বিপরীত তাদের অধিকার কায়েম করে তাদের আমিত্বকে উন্নত করে দেয়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ س وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু পুরুষদের যেহেতু রোযগার করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তাই নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

ইসলামের পূর্বে নারীকে পণ্যদ্রব্য মনে করা হতো। তাদের নিজস্ব কোনো ইখতিয়ার ছিলো না। পুরুষরা যথেচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করতো। কিন্তু ইসলাম এসে এ অবস্থা একদম পাল্টে দিলো। বিয়ের ক্ষেত্রে সে এটা অবশ্যম্ভাবী করে দিলো যে, যে পর্যন্ত নারীর–চাই সে ধনী পরিবারের হোক কিংবা দরিদ্র পরিবারের–সম্মতি না পাওয়া যাবে, তাকে বিয়ে করা যাবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"বিধবা নারীকে দ্বিতীয় বিয়ে দেয়া যাবে না, যে পর্যন্ত তার সাথে পরামর্শ না করা হবে। আর কুমারী মেয়েকে কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না, যে পর্যন্ত তার সম্মতি পাওয়া না যাবে।"

ইসলাম নারীকে কেনাবেচা ও মালিকানা সম্পর্কেও পূর্ণ ইখতিয়ার দিয়েছে। আরবের প্রচলিত প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত মীরাসে তাদেরকে শরীক সাব্যস্ত

www.pathagar.com

করেছে। জাহেলিয়াত যুগে তো নারীকেও ঘোড়া ও মাল-আসবাবের মতো তরকা (ত্যাজ্য সম্পত্তি) হিসাবে বণ্টন করা হতো। কিন্তু ইসলাম এসে এ জাহেলী প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ط

"(হে ঈমানদারগণ ! নারীদেরকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

ইসলাম নারীদের জন্য এটাও অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে যে, পুরুষদের মতো তাদেরকেও বায়আত করতে হবে। তাদের মাতা-পিতা, স্বামী বা পৃষ্ঠপোষকদের বায়আত করা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। এ সম্পর্কিত ঘোষণা সূরা মুমতাহানার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বিদ্যমান ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَّايُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ(الممتحنة : ١٢)

"(হে নবী ! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে বায়আত করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১২)

ইসলাম যেখানে নারীর সাথে সুব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে, সেখানে তার সাথে স্নেহ-মমতা ও পেয়ারের ব্যবহার করাও শিক্ষা দিয়েছে। আরবে যদি কারো গৃহে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, তবে সারা গৃহে বিষাদ নেমে আসতো এবং সবার চোখে-মুখে হতাশা ফুটে উঠতো। কিন্তু ইসলাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, তোমরা কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে দুঃখ-সন্তাপ প্রকাশ করবে না, বরং কন্যা সন্তানের জন্যও তোমরা সেরূপ আনন্দই প্রকাশ করবে, যেরূপ পুত্র সন্তান হলে তোমরা প্রকাশ

www.pathagar.com

করে থাকো। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যারা দুঃখ-সন্তাপ প্রকাশ করতো, আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করে বলেন ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ـ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ(نحل : ٥٨-٥٩)

"(তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান ! তারা যে সিদ্ধান্ত করে, তা কত নিকৃষ্ট।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৫৮-৫৯)

কখনো কখনো পুরুষের মন তার স্ত্রীর ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে এবং সে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কিন্তু এ সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, পুরুষ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাকে স্ত্রীর ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দিবে না এবং তার সাথে পূর্বের মতোই সু-আচরণ করতে থাকবে। কেননা, হতে পারে তার মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ(النساء : ١٩)

"তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা করো, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন কারীমের আহকাম পালনার্থে সাহাবাদেরকে নারীদের প্রতি সুবিচার করতে এবং তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই লোক, যে নারীদের সাথে সু-আচরণ করে এবং যে ব্যক্তি নারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পায়, সে ছোট লোক।"

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নারীদের প্রতি সু-আচরণ করতে যে কতখানি তাকীদ করেছিলেন, তা অনুমান করা যায় তাঁর এ হাদীস থেকে। তিনি বলেছেন ঃ

জিবরাঈল আমাকে নারীদের সম্পর্কে এত কড়া বিধান প্রদান করেছেন যে, আমি মনে করেছি না জানি তিনি তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানই নিয়ে আসেন।

আরবের উচ্চ পরিবারগুলোতে লেখা-পড়ার নিয়ম মোটেই ছিলো না। তাদের পুরুষরা শিক্ষা-দীক্ষাকে তাদের জন্য দূষণীয় মনে করতো। নারীদের তো কথাই ছিলো না। কিন্তু ইসলাম এসে যেখানে পুরুষদের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য করেছে, সেখানে নারীদের জন্যও তা জরুরী সাব্যস্ত করেছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরয।"

ইসলাম কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সে দাসীদেরকেও শিক্ষালংকার দ্বারা সজ্জিতা করতে চায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"যে ব্যক্তির কাছে কোনো দাসী থাকবে আর সে তাকে ভালোভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং তার শিক্ষাদানে কোনো ত্রুটি করবে না, তারপর তাকে আযাদ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে, সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।"

এ হচ্ছে সেই সম্মান ও মর্যাদা, যা নারী ইসলামী শরীআত থেকে লাভ করেছে। আর এ হচ্ছে সেই ইসলামী শিক্ষা, যার ওপর আমল করা সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। জাহেলী যুগে উচ্চ পরিবারের নারীরা কিছু অধিকার ভোগ করতো। ইসলাম এসে নগণ্য থেকে নগণ্যতর নারীকে তার চেয়ে অনেক বেশী অধিকার দান করেছে। তাদের মর্যাদা এত উচ্চে তুলে দিয়েছে যে, যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। আজ সর্বত্র নারী অধিকারের চর্চা হচ্ছে এবং নারীকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকারদানের আন্দোলন চলছে। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, নারী যখন প্রকৃত পক্ষেই দাসীর জীবনযাপন করতো, তখন ইসলাম তাকে মস্ত অধিকার ও সুযোগ দান করেছে এবং মানবজাতির মধ্যে নারী সমাজের মর্যাদা উন্নত করে দিয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, মুসলিম নারীদের সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, তবে আজ তারা যেসব অধিকার দাবী করছে, তার চেয়ে অনেক বেশী অধিকার লাভ করবে।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা নিছক সুন্দর সুন্দর বাক্যের সমষ্টি নয়। বরং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর হুবহু আমল করে প্রমাণ করে দিয়েছেন এ শিক্ষা কত বরকতময় ও কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর সাথে সু-আচরণ করাকে ঈমান ও নৈতিকতার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছিলেন এবং বারবার বলেছিলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। আর আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে সদা উত্তম ব্যবহার করে থাকি।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গৃহে অবস্থান করতেন, তখন গৃহকর্মে তার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করতেন। অবশ্য যখন নামাযের সময় হতো, তখন ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে চলে যেতেন। গার্হস্থ্য ব্যাপারে স্ত্রীদের সাহায্য করা ছিলো তাঁর প্রিয় কাজ। তিনি বলতেন, স্ত্রীদের কাজ করে দেয়াও সদকার মধ্যে গণ্য। তিনি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাদের সাথে বাক্যালাপ করতেন। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

"তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর বিবিদের সাথে মুলাকাত করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে মুচকি হাসি ফুটে থাকতো এবং তিনি তাদের সাথে খুব স্নেহমাখা আলাপ করতেন।"

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলা অবশ্যই অত্যুক্তি হবে যে, সে অমুক ব্যক্তির প্রতি তার পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি তাঁদের পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল ছিলেন। এমনকি তাঁর নিজের (আয়েশার) মাতা-পিতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহশীল ছিলেন। যিনি তাঁর কোমল হৃদয়ের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু।

হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার কোনো এক ব্যাপারে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে তর্ক হতে লাগলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এভাবে মীমাংসা হবে না। কাউকে সালিস নিযুক্ত করো। বলো, তুমি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহকে সালিস

www.pathagar.com

মানতে রাযী আছো ? আমি বললাম, না। তিনি খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। তিনি অবশ্যই আপনার পক্ষপাতিত্ব করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তুমি তোমার পিতাকে সালিস নিযুক্ত করো। আমি তাতে রাযী হলাম। তিনি আবু বকরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বিষয়টি তুলে ধরো। আমি বললাম, না, আপনি বলুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে তর্ক হচ্ছিলো আবু বকরের সামনে সেটি বিবৃত করলেন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার পর আমি আমার পিতাকে বললাম, এখন আপনি বলুন, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার কথা সত্য। তিনি একথা শুনেই আমার মুখের ওপর জোরে একটি থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, তুই রাসূলুল্লাহর কথার বিরোধিতা করছিস ? থাপ্পড় এতো জোরে লেগেছিলো যে, আমার নাক থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার এরূপ উদ্দেশ্য ছিলো না। একথা বলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার মুখের ওপর পানি ঢেলে রক্ত পরিষ্কার করতে লাগলেন।

স্বীয় স্ত্রীদের তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃতই ভালোবাসতেন। তাতে লৌকিকতা ও প্রদর্শনীর লেশ মাত্র ছিলো না। তাঁর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান এবং ঐ বছরটির নামই তিনি 'আমুল হুযন' বা শোকের বছর রাখেন। জীবনে কোনোদিন তিনি তাঁর বন্ধুত্ব ভুলেননি। সবসময় তিনি তাঁকে কোমল ভাষায় স্মরণ করতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদীজাকে এতো বেশী স্মরণ করতেন এবং এতো বেশী মুহব্বতের সাথে স্মরণ করতেন যে, তাঁর জীবিত স্ত্রীদের চেয়েও বেশী খাদীজার ওপর আমার ঈর্ষা হতে লাগলো। শেষে একদিন আমি আর আত্মসংম্বরণ করতে না পেরে বলেই ফেললাম ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি বারবার ঐ বুড়ির কথা কেনো স্মরণ করছেন ? আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে তার চেয়েও ভালো স্ত্রী দান করেছেন।

একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

আয়েশা ! এরূপ কথা বলো না। আমি খাদীজার চেয়ে ভালো কোনো স্ত্রী পাইনি। সে আমার ওপর এমন সময় ঈমান এনেছে, যখন লোকেরা কুফর অবলম্বন করেছে। সে আমাকে এমন সময় সমর্থন করেছে, যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সে এমন সময় আমাকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য

www.pathagar.com

করেছে, যখন লোকেরা আমাকে অর্থ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে। আর আল্লাহ তাআলা শুধু তার থেকেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন সেই সৌভাগ্যশালিনী নারীদের একজন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অফুরন্ত ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার নিয়ামত লাভ করেছিলেন। এ স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার ফলেই তিনি এমন মর্যাদা লাভ করেছেন, যার ধারে-কাছে পৌঁছাও সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন মুসলমানদের সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের অন্যতমা, যাদের আলোচনা ছাড়া ইসলামের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গই হতে পারে না।

www.pathagar.com

অমর নারী

বিশ্ব জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা এমন কতিপয় মহীয়সী নারীর কথা অবগত হই, যাঁরা তাদের মহান কীর্তির জন্য সুবিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এরূপ নারীগণ তাদের মর্যাদা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকার উপযুক্ত। কিন্তু মহত্তম ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সেই নারী, যিনি দীনী ময়দানে বিস্ময়কর কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন। শরীআতের বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর মর্যাদা উম্মতের নারীদের মধ্যে উচ্চতর।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কেবল প্রথমোক্ত নারীদের মধ্যেই নন, বরং শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যেও গণ্য। আর এটি এমন এক মর্যাদা, যা নারী সমাজের মধ্যে কদাচিৎ কেউ লাভ করে থাকে।

ধর্মীয় মর্যাদা ছাড়া হযরত আয়েশার আরো একটি দিক রয়েছে। যেটি উল্লেখ না করলে তাঁর জীবন চরিত পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তা হচ্ছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমরা এমন এক নারীর সন্ধান পাই, যার মধ্যে নারী চরিত্র পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথেই কেবল সীমিত নয়, বরং প্রতিটি বড় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনার সময়ই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ হিসাবে তার মর্যাদা কতটুকু উচ্চে। এ দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা ছাড়া ঐ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং পাঠকমহল তার জীবনগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় থেকে বঞ্চিত থাকবেন। কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ ঠিক তখনই হতে পারে, যখন তাকে মানবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করা হবে। ঐ কষ্টিপাথরে পূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই কেবল তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। নবী হওয়ার পদমর্যাদায় তিনি বিরাট বিরাট কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁর জীবনের এদিকটির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি যে, তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও—যার ওপর মর্যাদার পরিমাপ করা অসম্ভব—গার্হস্থ্য ব্যাপারে তাঁর পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করতেন, লাখ লাখ মানুষের প্রিয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে কাজ করতে অপমানবোধ করতেন না এবং

www.pathagar.com

তাঁর গৃহজীবন অন্যান্য সাধারণ লোক অপেক্ষা আদৌ ভিন্ন ছিলো না, তখন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের দৃষ্টিতে সহস্র গুণ বেড়ে যায়।

হযরত আয়েশার অবস্থাও তদ্রূপ। ধর্মীয় দৃষ্টিতে তিনি যে উচ্চমর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন, তার পরিমাপ করা সবার কাজ নয়। কিন্তু এরই সাথে তাঁর মধ্যে সকল নারী-বৈশিষ্ট্যও পূর্ণভাবে বর্তমান ছিলো, যার বহিঃপ্রকাশ তিনি সময় সময় করতে থাকতেন। আত্মমর্যাদাবোধ ও ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ, প্রেমের ছলনা ও কমনীয় ভঙ্গি, সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনের শখ, পরস্পর রেষারেষি ও ঘৃণাবোধ মোটকথা, যাবতীয় নারী-চরিত্র তাঁর সত্তার মধ্যে পুরোপুরি জমা হয়েছিলো।

পরস্পর রেষারেষি ও সতিনদের মুকাবিলায় আত্মমর্যাদাবোধের অধিকাংশ দিক হযরত আয়েশার জীবনে সমন্বয় ঘটেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী ছিলেন হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে হযরত আয়েশার বিয়ের কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু ঈর্ষার যে উন্মাদনা হযরত আয়েশার অন্তরে হযরত খাদীজার ব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছিলো, তা অন্য জীবিত স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোনো একজনের জন্যও হয়নি। তার একমাত্র কারণ ছিলো, হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে এরূপ স্থান কায়েম করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর থেকে তাঁর খেয়াল কখনো মিটে যেতে পারেনি। আর যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন, নবীর মুখে তার আলোচনা অহর্নিশ জারী থাকতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো দরিদ্র ও অভাবীকে অনবরত সাহায্য করতেন। একবার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাদীজা আমাকে ঐ লোকদের সাথে সু-আচরণ করতে থাকার ওসিয়াত করেছিলো। একথা শুনেই হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেনঃ

"মনে হচ্ছে আপনার কাছে পৃথিবীতে খাদীজা ছাড়া আর কোনো নারীই নেই।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণুচিত্ত। কিন্তু হযরত আয়েশার একথা শুনে তিনি তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। শেষে তাঁর মাতা উম্মু রূমান তাঁর পক্ষে সুপারিশ করলেন এবং বললেন

www.pathagar.com

ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আয়েশার বয়স কম। আপনি ওর কথার প্রতি বেশী ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদীজার কথা আলোচনা করছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি সবসময় ঐ বুড়ি ও লাল ঠোঁঠী নারীকে কেনো স্মরণ করতে থাকেন ? আল্লাহ তাআলা আপনাকে তো তার চেয়েও ভালো স্ত্রী দান করেছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আয়েশা ! তোমার ধারণা ভুল। খাদীজার চেয়ে ভালো আমি আর কোনো স্ত্রী পাইনি। সে আমার ওপর সেই সময় ঈমান এনেছে, যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপাদন করেছে। সে সেই সময় আমার জন্য তার সম্পদ ব্যয় করেছে, যখন লোকেরা আমাকে ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা খাদীজার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহাশ তাঁর জন্য মধুর ব্যবস্থা করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব আনন্দের সাথে তা পান করতেন। যেহেতু যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি খুব আকর্ষণও রাখতেন, তাই হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চিন্তা করলেন, না জানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যয়নবের প্রতি পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি হাফসা বিনতে উমারের সাথে মিলে একটি অভিসন্ধি রচনা করলেন। যার উদ্দেশ্য ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনকে যয়নবের সরবরাহকৃত মধুর প্রতি বিরূপ করে দেয়া। এ অভিসন্ধির অবস্থা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

"আমি হাফসার সাথে জোট বেঁধে পরিকল্পনা আঁটলাম যে, আমাদের মধ্য থেকে যার কাছেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গমন করবেন, সে তাঁকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি মাগফির পান করেছেন ? মাগাফির এক ধরনের মিষ্টি কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খুব অপসন্দ করতেন। যা হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হাফসার কাছে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে বসতেই হাফসা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। তিনি বললেন, আমি মাগাফির তো খাইনি, তবে যয়নব বিনতে

www.pathagar.com

জাহাশের কাছে মধু পান করেছিলাম। হয়তো তার মধ্যে মাগাফিরের দুর্গন্ধ থেকে থাকবে। ভবিষ্যতে আমি ঐ মধু পান করবো না।

হযরত আয়েশার আরেক সতিন হযরত সাফিয়্যা খুব ভালো খানা পাকাতে পারতেন। তাঁর হাতের খানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব আনন্দের সাথে আহার করতেন। হযরত আয়েশা এটাকে সুনজরে দেখলেন না। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আমি সাফিয়্যার চেয়ে ভালো রান্নাকারিণী আর কোনো স্ত্রীলোক দেখিনি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশার গৃহে অবস্থান করছিলেন। তখন সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা একটি কাঠের পেয়ালায় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু খানা পাঠালেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তা দেখে তাঁর ক্রোধ সংযত করতে পারলেন না। তিনি পেয়ালাটি এতো জোরে মাটির ওপর আছাড় মারলেন যে, সেটি ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কৃতকর্মে লজ্জিত হলেন। বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার এ কাজের কাফফারা কি হতে পারে ?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ পেয়ালার বদলে পেয়ালা এবং খানার বদলে খানা।"

সকল স্ত্রীর মধ্যে হযরত উম্মু সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খোলাখুলি মুকাবিলা করতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেযাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাই তাঁর সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা দেখে খুব কষ্ট পেতেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে আগমন করলেন। আমি বললাম, আপনি সারাদিন কোথায় ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, হুমায়রা ! আমি উম্মু সালমার কাছে ছিলাম। আমি বললাম, জানি না, উম্মু সালমার কাছে বসে থেকে আপনি কি পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে মুচকি হাসলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! বলনু তো। দু'টি উপত্যকা আছে। একটি উপত্যকা অনুর্বর। তার গাছ-গাছড়া গবাদি পশুতে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আরেকটি উপত্যকা শ্যামল ও সবুজ এবং গবাদি পশু থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এখন আপনি কোন্ উপত্যকায় ভ্রমণ করা পসন্দ করবেন ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ শ্যামল ও সবুজ উপত্যকায়। আমি বললাম, "তাহলে আমার মর্যাদা অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা উচ্চতম। কেননা, আমি ছাড়া

www.pathagar.com

আর কোনো কুমারী নারী আপনার বিবাহ বন্ধনে আসেনি।" একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন।

যে নারী এরূপ সাধারণ ব্যাপারে তার সতিনদের ওপর ঈর্ষা করতে পারে, তার সম্বন্ধে এটা পরিমাপ করা কঠিন নয় যে, কোনো স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার শত্রুভাবাপন্নতা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করবে। উম্মু ইবরাহীম মারিয়া কিবতিয়ার বিরুদ্ধে হযরত আয়েশার বিদ্বেষ ও ক্রোধ অন্যসব স্ত্রী অপেক্ষা অধিক ছিলো। তিনি তাঁর এ ঈর্ষা-কাতরতা ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্নতা অন্যান্য স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোপনও করেননি।

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত আয়েশা এতোই ভালোবাসতেন যে, তাঁর অসন্তুষ্টি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু একই সাথে তিনি একটি নারীমনও তাঁর নিজের মধ্যে লালন করতেন। তাঁর নারী প্রকৃতি দাবী করতো তিনি যখন তাঁর কোনো সতিনের মধ্যে এমন কোনো সৌন্দর্য দেখতে পেতেন, যা তাঁর প্রিয় স্বামীর মনোযোগকে তাঁর দিল থেকে হরণ করে নিতে পারে, তখন তার বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্ষোভ ও ঈর্ষা প্রকাশ করা। স্বীয় স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণকারী স্ত্রী তাঁর স্বামীর সন্তোষ বিধানের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রয়াসী হওয়াই যখন স্বাভাবিক, তখন তাঁর স্বামীর সন্তুষ্টির মূল কারণ যদি তার কোনো সতিন হয়, তবে তার বিরুদ্ধে তার ঈর্ষা ও ক্ষোভ প্রকাশ করাও প্রকৃতিসম্মত।

ঈর্ষা ও বিদ্বেষের এ দৃশ্য দেখে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশার ওপর অসন্তুষ্টও হতেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিলো নিছক তাঁকে সংশোধন করা—অন্য কিছু নয়। যেমন একবার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বললেন যে, তিনি হচ্ছেন বেঁটে নারী। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "আয়েশা ! তুমি এমন একটি কথা বললে, যা দ্বারা সমুদ্রের পানি ঘোলা করতে চাইলেও ঘোলা করতে পারবে।"

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশাকে এরূপ শিক্ষাদান করতে চাইতেন যে, কাউকে হেয় করা, উপহাস করা ও বিদ্রূপ করা কোনো মুসলমানের পক্ষে সাজে না। উম্মুল মু'মিনীন ও রাসূলুল্লাহর স্ত্রীর পক্ষে তো তা মোটেই শোভনীয় নয়।

প্রেমের ছলনা ও কথায় কথায় স্বামীর সাথে অভিমান করাও নারী-প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ চরিত্রটিরও বিরাট অংশ লাভ করেছিলেন। যদি বলা হয় প্রেমের ছলনায় খুব কম নারীই তাঁর সমকক্ষ, তবে ভুল হবে না।

www.pathagar.com

একবার উম্মাহাতুল মু'মিনীন (নবী সহধর্মিণীগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাবী জানালেন যে, তাঁদের খোরপোশের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হোক। কেননা, তাঁরা যে খোরপোশ পান, তা তাদের প্রয়োজন অনুপাতে খুব কম। কিন্তু এটা নবী-সহধর্মিণীদের মর্যাদার পরিপন্থী ছিলো যে, তারাও দুনিয়াদার লোকদের মতো ধন-দৌলতের পেছনে লেগে যাবেন। প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন। কিন্তু এ দাবী যখন ক্রমে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো, তখন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম করলেন যে, এক মাস পর্যন্ত কোনো স্ত্রীর কাছে যাবেন না এবং কারো সাথে কথাও বলবেন না। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন।

এ খবর শুনে লোকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। কেননা, রাসূলুল্লাহ কর্তৃক তাঁর সমস্ত স্ত্রীকে তালাক দেয়া সাধারণ ঘটনা ছিলো না। তার প্রভাব কেবল সাধারণ মুসলমানদের উপরই নয়, বরং সেইসব গোত্রের ওপরও পড়ছিলো, যাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সাহাবাদের ওপর এ চাঞ্চল্যকর খবরের কি প্রভাব পড়েছিলো, তার পরিমাপ এ ঘটনা থেকেই হতে পারে যে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের একজন আনসারী বন্ধু রাতের বেলা এ খবর শুনেই দৌড়াতে দৌড়াতে হযরত উমরের গৃহে আগমন করেন এবং এতো জোরে দরযায় করাঘাত করেন যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটে আসেন এবং বলেন, কি হয়েছে ? আনসার বন্ধু বললেন, আমি একটি ভয়ানক খবর নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, সে খবরটি কি ? খৃস্টানরা কি আক্রমণ করেছে ? আনসারী বন্ধু বললেন, না সে খবর তার চেয়েও বেশী ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন।

একথা শুনে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে এলেন এবং তার কাছে প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলেন। জানা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালাক দেননি, বরং মাত্র এক মাসের জন্য স্ত্রীদের কাছ থেকে বিচ্ছেদ অবলম্বন করেছেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি নিয়ে মুসলমানদেরকে (যারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় মসজিদে সমবেত ছিলেন) এ খবর পৌঁছে দিলেন যে, তালাকের খবর ঠিক নয়।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে তো কারো সন্দেহ হতেই পারে না যে, এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশী দুঃখিত হয়েছিলেন উম্মুহাতুল মু'মিনীন তথা নবী-সহধর্মিণীগণ। কেননা, এ ঘটনা সরাসরি তাদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত ছিলো। এরূপ কঠিন শাস্তি ইতো-পূর্বে তাঁরা আর কখনো পাননি। তাই এ ঘটনা তাঁদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। গোটা মাসটি তাঁরা ঘোর উদ্বেগের মধ্যে কাটান।

উনত্রিশ দিন পর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালাখানা থেকে নীচে নেমে আসেন এবং সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গমন করেন। যদিও আয়েশার পক্ষে বিচ্ছেদের এক একটি মুহূর্ত অতিবাহিত করাও দুরূহ ছিলো, কিন্তু তিনি তাঁর ছলনা প্রকাশ করা ছাড়া থাকতে পারলেন না। তাঁর মুখ থেকে প্রথম যে বাক্যটি বের হয়েছিলো, তাহলোঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কসম খেয়েছিলেন যে, সারা মাস আমাদের থেকে পৃথক থাকবেন, কিন্তু এখন তো মাত্র উনত্রিশ দিন অতীত হয়েছে। আপনি কিভাবে আগমন করলেন ?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।"

কেউ একথা কল্পনাও করতে পারবেন না যে, হযরত আয়েশা ত্রিশ দিন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার আকাংখী ছিলেন এবং সেই মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তাঁর কাছে রাসূলের আগমন করা পসন্দ করতেন না। তাঁর তো রাসূলের বিচ্ছেদের কারণে এক মুহূর্তও স্বস্তি ছিলো না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তিনি তাঁর অন্তর্লোকে একটি নারীর মনও লালন করতেন। আর একজন নারী তাঁর স্বামীর সাথে যেরূপ ছলনাই করুক না কেনো, তা যথার্থ।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনের গুরুতর ঘটনা হচ্ছে অপবাদ রটানোর কাহিনী। যা মুনাফিকরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিলো। এ অপবাদের কথা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক মাস পর অবহিত হন। নিজের সম্পর্কে এ ধরনের অশালীন অভিযোগের কথা শ্রবণ করে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর মা-বাবার কাছে অভিযোগ করলেন যে, গত এক মাস অবধি শহরে এ ধরনের আলোচনা হচ্ছে অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে একটি বর্ণও তাঁকে অবগত করেননি। এ ঘটনার উল্লেখ করে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

www.pathagar.com

"আমি আমার মা-বাবার ঘরেই ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, আয়েশা ! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ আমার গোচরীভূত হয়েছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তোমার সাফাই নাযিল করবেন। আর যদি তুমি বাস্তবিকই এ পাপে কলুষিত হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাও ও তাওবা করো। কেননা, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে তার পাপ ক্ষমা চায়, তখন সেই গাফুরুর রাহীমও তাকে ক্ষমা করে দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার যে অশ্রু গত কয় দিন থেকে প্রবাহিত হচ্ছিলো, তা তৎক্ষণাৎ থেমে গেলো। আমার মনে হচ্ছিলো যেনো আমার দু' চোখে অশ্রুর কোনো বিন্দুও ছিলো না। আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি কি জবাব দেবো, আমার কিছু বুঝে আসছে না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আপনি জবাব দিন। তিনিও বললেন যে, আমার কিছু বুঝে আসছে না।

আমি তখন অল্প বয়স্কা ছিলাম এবং কুরআন শরীফও বেশী পড়া ছিলাম না। এসব কথা শুনে আমি বললাম ঃ

"আপনি একথাটি এতো ধারাবাহিকতার সাথে শ্রবণ করেছেন যে, তা আপনার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর আপনি তা স্বীকার করে নিয়েছেন। আমি যদি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ তাআলা জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা আমার কথা মানবেন না। কিন্তু আমি যদি কোনো গুনাহের কথা স্বীকার করে নেই, অথচ আল্লাহ তাআলা জানেন যে, আমি তার থেকে মুক্ত, তবে আপনারা চট করে আমার কথা মেনে নিবেন। আল্লাহর কসম ! আমি কেবল সেই কথাই বলতে পারি, যা ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা বলেছিলেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ-

"সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।"-(সূরা ইউসুফ ঃ ১৮)

এরপর মুখ ফিরিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে গেলেন।

আল্লাহর কসম ! তখনো রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্থান থেকে উঠে দাঁড়াননি এবং গৃহবাসীদের কেউ বাইরে বেরোননি,

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর ওপর ওহী নাযিল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সে অবস্থাই প্রকাশ পেলো, যা ওহী নাযিলের সময় পেতো। ঐ সময় প্রচণ্ড শীত থাকা সত্ত্বেও মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক থেকে টপটপ করে পড়ছিলো। যখন এ অবস্থা কেটে গেলো, তখন তিনি হেসে দিলেন এবং প্রথম বাক্যটি এই বললেন যে, আয়েশা, তোমার সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তোমার সাফাই নাযিল করেছেন !

একথা শুনে আমার আম্মা বললেন, আয়েশা ! উঠে দাঁড়াও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুকরিয়া আদায় করো।"

আমি বললাম, আল্লাহর কসম ! আমি উঠবো না এবং আল্লাহ ছাড়া কারো শুকরিয়াও আদায় করবো না, যিনি আমার সাফাই নাযিল করেছেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হযরত আয়েশার অসন্তুষ্ট হওয়া প্রকৃতিসম্মতই ছিলো। তাঁর ওপর এমন এক অপবাদ আরোপ করা হয়েছিলো, যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তিই খোলাখুলি তার প্রতিবাদ করেনি। কেউ কেউ নীরব ছিলেন এবং কেউ কেউ ন্যক্কারজনকভাবে তাকে আলোচ্য বিষয় বানিয়েছেন। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর সাফাই নাযিল করলেন, তখন দুঃখ ও রাগে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন, আর তিনিও তাকে মন্দ ভাবেননি।

কখনো কখনো হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বেজার হতেন। কিন্তু স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। তবু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ তা আঁচ করে ফেলতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"আয়েশা ! তুমি যখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও, তখন সাথে সাথেই আমি তা অবগত হই।"

হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি তা কিভাবে অবগত হন ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, তখন বলে থাকো—মুহাম্মদের রবের কসম ! অমুক বিষয় এরূপ ! আর যখন অসন্তুষ্ট হও, তখন বলে থাকো —ইবরাহীমের রবের কসম ! এটি এরূপ।

www.pathagar.com

একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! একথা সত্য। অসন্তুষ্টির সময় আমি শুধু আপনার নাম উচ্চারণ ছেড়ে দেই।

ছলা-কলার একি সুন্দর দৃষ্টান্ত, যা হযরত আয়েশা পেশ করেছেন।

নারী-প্রকৃতির দাবী অনুসারে তিনি তাঁর ছোট বেলার ঘটনাবলীর প্রতি কৌতূহলী ছিলেন এবং সেসব ঘটনা খুব রসালোভাবে বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার দরুন যদিও তিনি খুব দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতেন, তবু তাঁর সাজসজ্জা করা ও জমকালো কাপড়-চোপড় পরার খুব শখ ছিলো। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, একবার আমি আমার গৃহাভ্যন্তরে একাকিনী ছিলাম। নতুন কাপড় পরে টহল দিচ্ছিলাম এবং বারবার এ অবস্থা দেখে আনন্দিত হচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গৃহে আগমন করলেন এবং বললেন ঃ

"আয়েশা ! তুমি কি জানো যে, আল্লাহ তাআলা এখন তোমাকে দেখছেন না !

আমি বললাম, কেনো ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"যখন কোনো পার্থিব বস্তুর কারণে বান্দার মধ্যে আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তখন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, যখন পর্যন্ত সে ঐ সাজসজ্জামূলক বস্তুকে নিজ অঙ্গ থেকে আলাদা না করবে।

একথা শুনে আমি সেই কাপড়টি খুলে ফেললাম এবং কিছু সাদকাও দিলাম। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"এখন আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তোমার গোনাহ মাফ করে দিবেন।"

এ ঘটনা থেকে হযরত আয়েশার চরিত্রের উভয় দিক ফুটে ওঠে। নারী-বৈশিষ্ট্যের বাহক হওয়ার দরুন তাঁর মধ্যে সাজসজ্জা করা ও নতুন নতুন কাপড় পরার দারুণ শখ ছিলো। এজন্যই তিনি তাঁর পরিধানের কাপড় দেখে দেখে আনন্দিত হচ্ছিলেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন। আর সেই হিসাবে তাঁর সবচেয়ে বড় বাসনা ছিলো আল্লাহ তাআলা যেনো তাঁর প্রতি কখনো নারাজ না হন। তাই যখনই তিনি অবগত হলেন যে, এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলার অসন্তোষের কারণ হয়, তৎক্ষণাৎ সেটি ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উম্মু রুমানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মু রুমানের নাম ও নসব সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম যয়নব ছিলো এবং কেউ কেউ বলেন ওয়াদ ছিলো। তিনি বানু কেনানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত আবু বকরের বিবাহ বন্ধনে আসার পূর্বে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে সানজারাহর পত্নী ছিলেন এবং তার ঔরসে তোফায়ল নামক এক পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিলো। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বিবাহ করেন।

তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তিনি ইসলামের শুরুতেই সত্য গ্রহণ করেন এবং মুসলমান হন। পরে হিজরতের সৌভাগ্যও নসীব হয় এবং দীনে হকের পথে তাঁর খ্যাতনামা স্বামী যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, তাতে তিনি তাঁর সাথে নিয়মিত অংশীদার ছিলেন। তাঁর সততা ও একনিষ্ঠা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

"যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় জান্নাতের হুর দেখতে চায়, সে উম্মু রুমানকে দেখে নিক।"

তাঁর মৃত্যু-সন নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসূল আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের জীবদ্দশায়ই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কিছু লোক মনে করেন, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইমাম বুখারীও শেষোক্ত বর্ণনাটি গ্রহণ করেন এবং আমাদের মতেও এ বর্ণনাই বিভিন্ন কারণে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

হযরত আয়েশা (রা) কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করেন, সে বিষয়ে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। প্রবল ধারণা হচ্ছে, তিনি হিজরতের এগার/বারো বছর পূর্বে ভূমিষ্ঠ হন। এ হিসাবে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আসার সময় তাঁর বয়স চৌদ্দ বছরের কাছাকাছি দাঁড়ায়।

রিওয়ায়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশার গায়ের রং লাল-সাদা ছিলো। এজন্যেই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হুমায়রা নামে ডাকতেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাংগী। কেননা, হাদীস থেকে

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বেঁটেপনা পসন্দ করতেন না। তাই একবার তিনি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সতিন হযরত সাফিয়্যা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে তো বেঁটে নারী।"

একথা শুনে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

আয়েশা ! তুমি (নৈতিক দিক থেকে) এমন একটি কথা বলেছো, যা দ্বারা সমুদ্রের পানি ঘোলা করতে চাইলেও ঘোলা করতে পারবে।

ছোট বেলায় তিনি খুব হালকা-পাতলা ছিলেন। তাই অপবাদের ঘটনা (وَاقِعَةُ افك) প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

"হাওদা উটের ওপর স্থাপনকারী এলো এবং আমার হাওদাটি উঠিয়ে উটের ওপর রাখলো। তার ধারণা ছিলো আমি হাওদার মধ্যেই আছি। সেকালে নারীরা হালকা-পাতলা হতো এবং তাদের শরীরে বেশী গোশত থাকতো না। কেননা, তারা খাবার পেতো খুব কম। আমি তো সে সময় ছিলামও অল্প বয়স্কা। সুতরাং যে সময় হাওদা উত্তোলনকারীরা হাওদাকে উটের ওপর রাখলো, তখন হালকা-পাতলা হওয়ার দরুন হাওদা খালি থাকায় তাদের সন্দেহও হয়নি।"

তবু কয়েক বছর পর তাঁর মধ্যে কিছুটা স্থূলতা এসে গিয়েছিলো। তাই অন্য এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

"আমি একবার সফরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমি অল্পবয়স্কাই ছিলাম। আমার শরীরে বেশী গোশত ছিলো না। পথিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহযাত্রীদের বললেন ঃ তোমরা কিছুটা সামনে অগ্রসর হও। লোকেরা সামনে অগ্রসর হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় নামি। দেখি কে বাজি জিততে পারে।" আমি যেহেতু হালকা-পাতলা ছিলাম, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে চলে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন এবং কিছুই বললেন না।

তারপর আরেকবার সফরের সুযোগ এলো। রাসূলুল্লাহ পূর্বের মতো লোকদেরকে সামনে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বললেন। তখন আমার শরীর মোটা হয়ে গিয়েছিলো। তাই আমি দৌড়ে রাসূল

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে রয়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হেসে বললেন ঃ

"আয়েশা ! সেই পেছনের বদলা শোধ হয়ে গেলো।"

হযরত আয়েশার বর্ণনাকৃত কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, ভীষণ জ্বরের কারণে তাঁর মাথার কেশ ঝরে পড়েছিলো। তাই মোটামুটি অন্যান্য রিওয়ায়াতের মধ্যে একটি রিওয়ায়াত এও আছে যে, একবার তিনি নারীদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে নারীর কেশ আছে, সে তা পরিপাটি করে রাখবে।"১

জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) ঘটনাবলী পাঠ করলে এও জানা যায় যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন এক উচ্চভাষী সুন্দরী মহিলা। বাগ্মিতায় তার বিশেষ দখল ছিলো। তাই তিনি যখন তাঁর হাওদায় আরোহণ করে সেনাদলের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন গোটা সেনাদলের মধ্যে নীরবতা ছেয়ে যেতো। প্রতিটি ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তৃতা শুনতো।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সমগ্র গুণ ও চরিত্রাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ স্বভাব-চরিত্র তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ। তাই কোনো কোনো বর্ণনা মতে 'আতীক' উপাধি তিনি তাঁর সৌন্দর্যের কারণেই লাভ করেছিলেন। তিনি ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশাও ছিলেন শীর্ণকায়া। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের মেযাজে ঈষৎ তীক্ষ্ণতা ছিলো। হযরত আয়েশার অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ। তিনি তীক্ষ্ণধী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। হযরত আয়েশার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার ব্যাপারে কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে ? হযরত আবু বকর সিদ্দীক অত্যন্ত দয়ার্দচিত্ত ছিলেন। অভাবী, দরিদ্র ও মিসকীনদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিলো অপরিসীম। হযরত আয়েশাও বদান্যতা ও দানশীলতার ক্ষেত্রে এরূপই ছিলেন। তিনি গরীব ও মিসকীন নারীদের প্রতি অতিশয় দয়ালু ও স্নেহশীল ছিলেন।

---

১. এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট এক রিওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বিবাহ ও রুখসতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার বিবাহ হয়েছিলো ছয় বছর বয়সে (মক্কায়)। আমরা মদীনায় হিজরত করে বানুল হারিস ইবনে খাযরাজ মহল্লায় অবতরণ করলাম। সেখানে আমার জ্বর আরম্ভ হলো। এ জ্বরে আমার মাথার কেশ ঝরে পড়লো।–(সহীহ আল বুখারী)

www.pathagar.com

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জাহেলিয়াত ও ইসলাম—কোনো যামানায়ই মিথ্যা কথা বলেননি। আর এ কারণেই তাঁকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলা হয়। হযরত আয়েশারও সারা জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলার প্রমাণ নেই। আর এ স্বভাবের কারণেই আজ পর্যন্ত তাঁকে সিদ্দীকা (সত্যবাদিনী) উপাধিতে স্মরণ করা হয়। হযরত সিদ্দীক অত্যন্ত বাগ্মী ও বাকপটু ছিলেন। হযরত আয়েশার বাকশক্তি ও বাগ্মিতার আলোচনা ও হাদীসের কিতাবসমূহ ভরপুর হয়ে আছে। মোটকথা, স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সম্পূর্ণ তাঁর পিতার অনুরূপ। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত আয়েশার কথাবার্তা শুনতেন, তখন বলতেন ঃ

"হবে না কেনো, আবু বকরের কন্যা তো !"

সাধারণত দেখা যায়, যে ব্যক্তির মেযাজে তীক্ষ্ণতা থাকে, সে সহসাই রাগান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ অবস্থা স্বল্পস্থায়ী হয়। কিছুক্ষণ পর যখন তার রাগ চলে যায়, তখন তার মনেও থাকে না কি ঘটনা ঘটেছিলো। এরূপ ব্যক্তি ক্ষমা করে দিতেও কার্পণ্য করে না এবং খুব তাড়াতাড়ি দোষীদের দোষ ক্ষমা করে দেয়। এ অবস্থা হযরত আয়েশারও ছিলো। যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে তিনি কোনো কষ্ট পেতেন, তবে তাকে অতি দ্রুত ক্ষমা করে দিতেন। অবশ্য ইফক তথা অপবাদ ঘটনার কথা চিরদিন তাঁর মনে জাগরূক ছিলো। তিনি অপবাদ দানকারীদের কথা কখনো ভুলতে পারেননি। ভুলতে না পারার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই যথার্থ ছিলেন। হযরত আয়েশা কেনো, কোনো সতী নারীই এরূপ জঘন্য ও নোংরা অপবাদ বরদাশত করতে পারে না, যাতে তার সতীত্ব ও সচ্চরিত্রের ওপর সামান্য মাত্রও কলঙ্ক আসতে পারে। সুতরাং আয়েশা সিদ্দীকার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনায় তাঁর মনের মধ্যে যে কিরূপ দুঃখ-বেদনার সৃষ্টি হয়েছিলো, তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। এ একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমরা এরূপ আর কোনো ঘটনা দেখতে পাই না যে, আয়েশা কোনো তরফ থেকে কোনো ব্যথা পেয়েছেন কিন্তু তিনি তা ক্ষমা করে দেননি।

মাসরূক হামদানী বর্ণনা করেন ঃ

"আমি হযরত আয়েশার দরবারে হাযির হলাম। তখন হাসসান ইবনে সাবিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কন্যার মর্ছিয়া (শোকগাথা) পড়ছিলেন। তিনি যখন এ পংক্তি পর্যন্ত পৌঁছেন ঃ

رزان حصان ما تزن بريبة + وتصبح غرثى من لحوم الغوافل-

অর্থাৎ, সে পুণ্যশীলা ও মর্যাদাশীলা ছিলো। সন্দেহযুক্তা ছিলো না এবং নিরীহ মেয়েদের গোশত ভক্ষণ করা (পরোক্ষে নিন্দা করা থেকে বিরত

www.pathagar.com

থাকতো।) তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ কিন্তু তুমি তো এরূপ নও।২

এ অবস্থা দেখে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, আপনি হাসসানকে দরবারে ঢোকার অনুমতি দেন কেনো ? অথচ আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে বলেন ঃ

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

"এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে (মিথ্যা অপবাদ রটানোয়) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।"–(সূরা আন নূর ঃ ১১)

একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ তুমি দেখতে পাচ্ছো না যে, কি পরিমাণ কষ্টদায়ক আযাবে সে লিপ্ত রয়েছে। তার চোখ দু'টি যেতে বসেছে।

এ বর্ণনা থেকেই বুঝা যায় ঐ ঘটনার দরুন হযরত আয়েশার মনে কত কষ্ট ছিলো। এমনকি তিনি হাসসানকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছিলেন যে, তুমি আমার ওপর কি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিলে !

অবশ্য কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি হাসসানকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাই ইউসুফ ইবনে মালিক তাঁর মাতার প্রমুখাৎ এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে,

"আমি হযরত আয়েশার সাথে কা'বাঘর তওয়াফ করছিলাম। কথায় কথায় হাসসানের প্রসঙ্গ এসে গেলো। আমি তাকে গালমন্দ করলাম। হযরত আয়েশা বললেন, "তুমি হাসসানকে গালমন্দ করছো, অথচ সে এ কবিতা রচনা করেছে ঃ

فان ابى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم وقاء-

(আমার পিতা, পিতামহ ও আমার ইযযত-সম্ভ্রম মুহাম্মদের ইযযত তোমাদের (কাফেরদের) থেকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ।)

আমি বললাম, হাসসান কি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের প্রতিশোধ স্বরূপ দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

২. হাসসান ইবনে সাবিতও হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ দানকারীদের দলভুক্ত ছিলেন। হযরত আয়েশা সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।–অনুবাদক

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন ঃ

এ হাসসানই তো আবার আমার সম্পর্কে এ কবিতা রচনা করেছেন ঃ

حصان رزان ماتزن بريبة + وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ـ

فان كان ماقد جاء عنى قلته + فلا رفعت سوطى الى اناملى ـ

(আয়েশা, তুমি খুব মর্যাদাশীলা ও পুণ্যবতী মহিলা। তাঁর সতীত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে না। তিনি নিরীহ নারীদের গোশত ভক্ষণ করেন না। আমার প্রতি যে বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহ করুক আমার হাত যেনো সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।)

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমি হযরত আয়েশার কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সেখান দিয়ে হাসসান ইবনে সাবিতের জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু অশোভন উক্তি করলাম। কিন্তু হযরত আয়েশা আমাকে থামিয়ে দিলেন এবং তার কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি হাসসানকে গালমন্দ করছো, অথচ এ কবিতাটি তারই রচিত ঃ

فان ابى ووالده وعرضى

لعرض محمد منكم وقاء

(আমার পিতা ও তার পিতা (অর্থাৎ আমার পিতামহ) এবং আমার ইযযত-সম্মান মুহাম্মদের ইযযত তোমাদের (কাফেরদের) হাত থেকে রক্ষা করার ঢাল স্বরূপ।)

যা হোক, এটা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, যদিও হাসসানের অপকাণ্ড হযরত আয়েশা ভুলতে পারতেন না, তবু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার পরোক্ষ নিন্দা দ্বারা স্বীয় যবানকে কলুষিত করেননি।

হযরত আয়েশার চরিত্রে বদান্যতার প্রেরণা ছিলো কানায় কানায় পূর্ণ। এ অভ্যাস তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার পদাংক অনুসরণ করা স্বীয় কর্তব্য মনে করতেন। দাসদের মুক্ত করা, সহায়হীনদের সহানুভূতি প্রদর্শন করা, অভাবীদের সাহায্য করা এবং বিপদগ্রস্তদের কষ্ট দূর করায় তাঁর অর্থ-সম্পদ অকাতরে ব্যয় হতো। তাঁর দরিদ্র পালন, বদান্যতা, দানশীলতা ও উদারতার এ অবস্থা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই সমান ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় তাঁর জীবন

www.pathagar.com

খুব কষ্টে অতিবাহিত হয়। ধন-দৌলত তো দূরের কথা, দু' বেলা খাবার খুব কষ্টে যোগাড় হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যখন বিভিন্ন দেশ বিজিত হয় এবং মদীনায় বিপুল অর্থাগম শুরু হয়, তখন নবী সহধর্মিণীদের জন্য যথেষ্ট ভাতা বরাদ্দ হলো। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অভ্যাস পরিবর্তন হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও তাঁর কাছে যা থাকতো, তিনি তা অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একথা চিন্তা করতেন না যে, আগামী দিনের অন্ন সংস্থান কিভাবে হবে। পরবর্তীকালে যখন ধন-দৌলতের প্রাচুর্য দেখা দেয়, তখনো কখনো এরূপ হয়নি যে, বরাদ্দ এসে গেছে অথচ সন্ধ্যার পূর্বে তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টিত হয়নি।

উতবা ইবনে আবু হালবের বারীরা নাম্নী এক হাবশী দাসী ছিলো। মুগীরার এক গোলামের সাথে তার সম্মতি ছাড়া তার বিয়ে হয়েছিলো। বারীরা তার স্বামীকে অত্যন্ত ঘৃণা করতো। সে তার সাথে সম্পর্ক রাখা আদৌ পসন্দ করতো না। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার প্রতি দয়া করে উতবার কাছ থেকে খরীদ করে আযাদ করে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, বারীরা দাসী থাকাকালে তার সম্মতি ছাড়া তাকে বিবাহ দেয়া হয়েছিলো। এখন সে ইচ্ছা করলে তা ভেঙ্গে দিতে পারে কিনা ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ

সে এখন নিজেই তার মালিক-মুখতার। সে ইচ্ছা করলে বিয়ে ভেঙ্গেও দিতে পারে, বহালও রাখতে পারে।

বারীরার স্বামীর অবস্থা ছিলো তার বিপরীত। সে তাকে অত্যধিক ভালোবাসতো এবং সবসময় তার পিছনে পিছনে ঘুরতো। কিন্তু বারীরা তার দিকে মোটেই ফিরে তাকাতো না। স্বামী-স্ত্রীর এ বিপরীত অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্মিত হলেন এবং তিনি সাহাবাদের সাথে আলোচনা করলেন যে, বারীরার স্বামীকে দেখো, যদিও স্ত্রী তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করছে, কিন্তু তার মুহব্বতের হাল এমন যে, সে তার থেকে আলাদা হওয়া একেবারেই পসন্দ করে না। শেষে তিনি বারীরাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং স্বীয় জেদ ত্যাগ করো। সে তোমার স্বামী এবং তোমার পুত্রের পিতা। সে বললো, আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, আমি আদেশ করছি না, শুধু সুপারিশ করছি। কিন্তু বারীরা তাতেও সন্তুষ্ট হলো না এবং বললো, আমি আমার স্বামীকে ঘৃণা করছি এবং আমি তার কাছে যেতে চাই না।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বারীরার প্রতি যে দয়া করেছিলেন, তার ফল এই দাঁড়ালো যে, বারীরা স্থায়ীভাবে তাঁর খেদমতেই থাকতে লাগলো এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দয়ার বিষয়টি কখনো ভুলেনি।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সচ্চরিত্রের যে প্রভূত অংশ লাভ করেছিলেন, তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো সেই পবিত্র সত্তার সান্নিধ্য, যাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' উপাধি দান করা হয়েছিলো এবং যিনি যথার্থভাবেই ইয়াতীমদের অভিভাবক ও গোলামদের মুক্তি দাতা ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যে প্রকৃতিগত চরিত্র দান করা হয়েছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য তাকে উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছিলো। প্রমাণ স্বরূপ নীচের ঘটনাটি লক্ষ্য করুন ঃ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফারেআ বিনতে আসআদ নামের একটি ইয়াতীম বালিকা ছিলো। তাকে তিনি নাবীত ইবনে জাবির আনসারীর সাথে বিবাহ দেন এবং স্বয়ং তাকে স্বামীর ঘরে রাখার জন্য গমন করেন। যখন ফিরে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু গান-বাদ্যের আয়োজনও করেছিলে কিনা ? তিনি জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! গান-বাদ্যের তো কোনো আয়োজন করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার উচিত ছিলো কোনো বালিকাকে পাঠিয়ে দেয়া। সে দফ বাজাতো এবং এ গান গাইতো ঃ

اتيناكم اتيناكم+فحيونا نحيكم

ولولا الذهب الاحمر + ماحلت بواديكم

ولولا الحنطة السمراء + ماسنت عذاريكم-

অর্থ ঃ আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা আমাদের সালাম করো, আমরা তোমাদের সালাম করছি। যদি স্বর্ণ না থাকতো, তবে গহনারও নাম-নিশানা থাকতো না। আর যদি গমের দানা না হতো, তবে তোমাদের কুমারীদের গায়ে কখনো গোশত হতো না।

হযরত আয়েশার এক সেবিকা উম্মু যাররাহ বর্ণনা করেন, একবার হযরত আয়েশার ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দু'টি বড় থলে ভর্তি করে এক লাখ দিরহাম পাঠালেন। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। তিনি একটি বড় পাত্র আনিয়ে তাতে দিরহামগুলো ঢেলে বিতরণ করা শুরু

www.pathagar.com

করলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি খাবার জন্য কিছু আনতে বললেন। আমি বললাম, উম্মুল মু'মিনীন ! ইফতার করার জন্য তো কিছুই নেই। আপনার উচিত ছিলো ঐ অর্থ থেকে এক দিরহামের গোশত আনিয়ে নেয়া। কিন্তু আপনি সবগুলো দিরহামই বণ্টন করে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, উম্মু যাররাহ ! আমাকে তিরস্কার করো না। তুমি যদি ঐ সময় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তবে আমি রেখে দিতাম।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমার সামনে হাজারটি মুদ্রা দান করেন এবং দোপাট্টার খোঁট ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান।

এসব বর্ণনা থেকেই অনুমান হতে পারে বদান্যতা ও দানশীলতার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কতদূর অগ্রসর ছিলেন।

স্বভাব-চরিত্রের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা সঠিক অর্থেই স্বীয় পিতার কন্যা ছিলেন। আখলাক-চরিত্রের যে মিল এ দু'জনের মধ্যে পাওয়া যায়, তার উদাহরণ মেলা অসম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে চরিত্রটি এ দু'জনের মধ্যে ছিলো তা হচ্ছে, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা। এ চরিত্রটি কেবল দু' বাপ-বেটির মধ্যে অভিন্নই ছিলো না, বরং তাদের ও অন্যান্য লোকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারীও ছিলো। আর এ কারণেই হযরত আবু বকরের সিদ্দীক উপাধি প্রসিদ্ধ হয় এবং এ উপাধি এতোই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তাঁর সামনে লোকেরা তাঁর আসল নাম ভুলে যায়। আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার পরীক্ষা বড় নাজুক মুহূর্তে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে সর্বদা খাঁটি সোনা রূপেই বের হয়েছেন। হযরত আয়েশার সাথেও কয়েকবার এরূপ ঘটনাই ঘটেছে এবং তাঁকেও কষ্টিপাথরে বহুবার পরখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবার তিনি তাঁর কৃতকর্ম দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে যে উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, তা তিনি কোনোভাবেই ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। সেই ভয়াবহ সময়ের কথা কল্পনা করো, যখন সারা ইসলামী জগত মতানৈক্যের আগুনে জ্বলছিলো, উভয় দল নিজের স্বপক্ষে জাল হাদীস রচনা করে তা জনগণের সামনে নির্দ্বিধায় পেশ করছিলো। জাল হাদীস রচনাকারীদের একটি দল কয়েকটি টাকার জন্য এ নোংরা কাজে লিপ্ত ছিলো। পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করেছিলো যে, হযরত আয়েশাকেও বাধ্য হয়ে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিলো। তিনি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই লোকদেরকে এমন এমন হাদীস শুনাতে পারতেন, যার দ্বারা তাঁর বিরোধীদের ছোট করা উদ্দেশ্য হতো। কোনো ব্যক্তিরই তাতে সন্দেহ

www.pathagar.com

করার অবকাশ হতো না। কেননা, তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে কেটেছিলো। কিন্তু তিনি তাঁর আঁচল এ আবিলতা থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনার সময় কখনো নিজ মুখ থেকে এমন কোনো শব্দ বের করেননি, যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেননি। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র যবানে যাকিছু বলেছিলেন, তা কখনো খণ্ডন করেননি এবং তাঁর মর্যাদা ও জ্ঞান-বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বদা স্বীকার করেছেন। এ এমন এক পরীক্ষা ছিলো, যার চেয়ে বড় পরীক্ষা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু তিনি সর্বদা সত্যবাদিতাকে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বানিয়ে রাখেন এবং ব্যক্তি স্বার্থের কর্দমে জড়িয়ে কখনো তাঁর আঁচলকে মিথ্যা দ্বারা মলিন করেননি। আর এ কারণেই যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তখন বলেন যে, আমার কাছে একথা 'সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক' বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞান, প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেও তিনি তাঁর পিতার সমপর্যায়ের ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক লোকদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই এমন ছিলো না, যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও রাজনীতি, বিষয়বোধ ও দূরদর্শিতায় তাঁর মুকাবিলা করতে পারে। পরিণাম ফল বের করা এবং ঘটনার গভীরে পৌঁছে যাওয়ার বিস্ময়কর যোগ্যতা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।

আবু যিনাদ বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুর বহুসংখ্যক শে'র (কবিতা) মুখস্থ ছিলো। কোনো এক ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, শে'র মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তো আপনি পূর্ণতা লাভ করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, আমার পূর্ণতা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পূর্ণতার সামনে কিছুই নয়। তাঁর তো অবস্থা ছিলো এই যে, যখন কোনো ঘটনা ঘটতো তিনি তৎক্ষণাৎ তদুপযোগী শে'র পাঠ করে ফেলতেন।

উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নে ছিলেন এবং তিনি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। উরওয়াও তার খালাকে যারপরনাই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন এবং তাঁর সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলতেন না, যা অবান্তর ও তাঁর পক্ষে মর্যাদা হানিকর। তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাহিত্য-আস্বাদন ক্ষমতা ও ভাষা-জ্ঞান সম্পর্কে যেসব রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাঁর স্মরণ-শক্তি কত প্রখর ছিলো। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.pathagar.com

গৃহে আগমন করে শুনতে পান যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কবিতাটি আবৃত্তি করছেন ঃ

ارفع ضعيفك لايحوبك ضعفه + يوما فتدركه العواقب قدنما

يحزيك اوثبنى عليك وان من + اثنى عليك بما فعلت فقد جزى

(দুর্বল ও হীনবল মানুষকে সাহায্য করো এবং তাকে নীচতা থেকে টেনে তুলে উচ্চস্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করো। একথা ভেবো না যে, এ দুর্বল ও হীনবল মানুষ আমার কি সাহায্য করতে পারে ? হতে পারে এমন দিনও আসবে যখন সে তোমার অনুগ্রহের প্রতিদান পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু সে যদি কার্যত তোমার অনুগ্রহের প্রতিদান পরিশোধ করতে নাও পারে, তবু কোনো কথা নেই। কেননা, তার আন্তরিক দুআই তোমার জন্য উত্তম প্রতিদান প্রমাণিত হবে।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কবিতা শুনে বললেন ঃ

"জিবরাঈল আমার কাছে আমার রবের এ পয়গাম নিয়ে এসেছিলো যে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর অনুগ্রহ করে এবং সে ঐ অনুগ্রহের প্রতিদানে তাকে দুআ করে বা তার প্রশংসা করে, তবে এ দুআ ও প্রশংসাই তার জন্য যথেষ্ট।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুর কয়েকটি কবিতা মুখস্থ করেছিলেন এবং তিনি তা প্রায়শ আবৃত্তি করতেন। প্রখর গ্রীষ্মকাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে বসে তাঁর জুতা মেরামত করছিলেন। তার কপাল থেকে ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়ছিলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ

হায় ! উরওয়া যদি এ অবস্থায় আপনাকে দেখতো ! আপনি হুবহু এ কবিতার প্রতিরূপ ঃ

فلو سمعوا فى مصرا وصاف خدّه + لما بذلوا فى سوم يوسف من نقد

لواحى زليخالور أين جبينه + لاثرن بقطع القلوب على الايدى

(মিসরবাসী যদি আমার প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনতে পেতো, তবে ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য কখনো তাদের পুঁজি ব্যয় করতো না। আর যুলায়খার সখীরা যদি তার উজ্জ্বল ললাটের জ্যোতি দেখতে পেতো, তবে হাত কাটার পরিবর্তে কলজে টুকরো টুকরো করাকে প্রাধান্য দিতো।)

www.pathagar.com

যখন তাঁর পিতার অন্তিমকাল এলো, তখন তাঁর মুখে এ কবিতা উচ্চারিত হলো ঃ

لعمرى مايغنى الثراء عن الفتى + اذا لحشر جيوما وضاق بها الصدر

(আমার প্রাণের কসম ! যখন মানুষ জান কবযের কষ্টে লিপ্ত হয় এবং শ্বাস না আসার দরুন তার সীনা সংকীর্ণ হতে থাকে, তখন ধন-দৌলত কাজে আসে না।)

এ কবিতাটিও সেই সময় তিনি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

وابيض يستسقى الغمام بوجهه + ثمال اليتامى اعصمة لارامل

(তিনি দানশীলতা ও বদান্যতায় এতোই অগ্রসর ছিলেন যে, মনে হচ্ছিলো মেঘও বুঝি তার মাধ্যমেই পানি লাভ করে থাকে। তিনি ইয়াতীমদের অভিভাবক ও বিধবাদের রক্ষাকারী।)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর প্রাণ তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে সমর্পণ করলেন, তখন তিনি এ কবিতাটি পড়েন ঃ

وكل ذى غيبة يؤب + وغائب الموت لايؤب

(দৃষ্টি থেকে উধাও হওয়া সব জিনিসেরই ফিরে আসার আশা থাকতে পারে। যদি না থাকতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির—যাকে মৃত্যু দৃষ্টি থেকে উধাও করেছে।)

একবার তিনি আরবের বিখ্যাত কবি যুহায়রের কয়েকটি কবিতা—যা তিনি হারাম নামক জনৈক ব্যক্তির প্রশংসায় বলেছিলেন—শ্রবণ করেন। ঐ কবিতা-গুলো তাঁর এতোই পসন্দ হলো যে, তিনি যুবায়রের কন্যাকে বললেন ঃ

"যে অলংকার তোমার পিতা হারামকে পরিধান করিয়েছেন, সময়ের সুদীর্ঘতার দরুন তা ধ্বংস হতে পারে না।"

প্রশস্তিমূলক কবিতার প্রশংসা এর চেয়ে উত্তম ভাষায় আর কিভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ?

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্মরণশক্তির পরিধি কাব্য ও সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রকেও পরিবেষ্টন করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তার সংখ্যা দু' হাজারের ওপরে। এসব হাদীস বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কিত। তাতে শরঈ আহকামও বর্ণিত হয়েছে এবং চারিত্রিক উপদেশও। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উল্লেখও তাতে বিদ্যমান রয়েছে এবং দীনী মূলনীতি ও ইবাদাতের ব্যাখ্যাও।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইলম কেবল হাদীস মুখস্থ রাখা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং তিনি প্রত্যেক হাদীসের সূক্ষ্মকথা ও ফিকহ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত ছিলেন এবং প্রয়োজন মতো তিনি তা বর্ণনা করতে থাকতেন।

আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদেরও কোনো মাসআলা বুঝার ব্যাপারে যদি কোনো জটিলতা দেখা দিতো, তবে আমরা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে চলে যেতাম এবং তাঁকে আলোচ্য মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি অত্যন্ত আলিমসুলভ পদ্ধতিতে সেই মাসআলার চুলচেরা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করতেন।

আতা ইবনে আবী রিয়াহ বলেন ঃ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, আলিম এবং জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় উত্তম রায়দানকারী ছিলেন।

মাসরূক হামদানী বলেন ঃ

"আমি জালীলুল কদর ও প্রবীণ সাহাবাদেরকে হযরত আয়েশার কাছে মীরাসের মাসআলাহ জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।"

উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

আমি হালাল ও হারামের মাসআলা, শিল্প ও বিজ্ঞান, কাব্য ও চিকিৎসা শাস্ত্রে হযরত আয়েশার চেয়ে বড় কাউকে ওয়াকিফহাল দেখিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও এ ধরনের হাদীসসমূহ সম্পর্কযুক্ত করা হয় যে, অর্ধেক দিন 'হুমায়রার' (হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার) কাছে শেখো। যদিও এ হাদীসগুলোর সনদ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, তবু এতে সন্দেহ নেই যে, মুসলমানগণ হাদীস ও ইলমে দীনের মস্তবড় অংশ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছেন। আর নিশ্চিত রূপেই এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি সমস্ত সাহাবা অপেক্ষা অগ্রণী।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জাহেলী যুগের ঘটনাবলী এবং গোত্র ও ব্যক্তিবর্গের বংশাবলীও কণ্ঠস্থ ছিলো। কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আরব ছাড়া অন্যান্য জাতি ও ধর্মের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো এবং তিনি অতি বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা করতেন। এ

www.pathagar.com

সম্পর্কীয় অনেক ঘটনার মধ্য থেকে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

মক্কার কাফেরদের যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন কিছুসংখ্যক মুসলমান হাবশার দিকে হিজরত করলো, তখন মক্কাবাসী তাদেরকে শাস্তিদান ও মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো। এ প্রতিনিধি দলটি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উপঢৌকন নিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে হাযির হলো এবং উপঢৌকন পেশ করে মুসলমানদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করার আবেদন করলো। কিন্তু নাজ্জাশী উপঢৌকন গ্রহণ করা এবং মুসলমানদেরকে কুরায়শ কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে পরিষ্কার অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ তাআলা যখন আমার দেশ আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার সময় ঘুষ গ্রহণ করেননি, তখন আমি কিভাবে ঘুষ গ্রহণ করতে পারি ? আর লোকেরা যখন আমার আনুগত্য করেনি এবং আমার পরিবর্তে আমার দুশমনের হাত মযবুত করেছে, এখন আমি তাদের কথা কিভাবে মানতে পারি ?"

মুসলমানগণ নাজ্জাশীর এ কথার মর্ম বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। হযরত আয়েশা (রা) যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন ঃ

"নাজ্জাশী তাঁর শত্রুদের পক্ষ থেকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। জনৈক দরবারী আমীর ষড়যন্ত্র করে তাঁর সিংহাসন দখল করে নিয়েছিলো এবং তাঁকে গোলাম বানিয়ে কোনো এক দূরবর্তী অঞ্চলে বিক্রি করে দিয়েছিলো। কিন্তু পরে অবস্থা এরূপ পালটে গেলো যে, নাজ্জাশী তাঁর হারানো সিংহাসন পুনরায় লাভ করলেন। নাজ্জাশী অন্যান্য বাদশাহদের বিপরীত নিজের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি হতে দেননি। বরং গরীব ও মযলুমদের সাহায্য করা স্বীয় অভ্যাসে পরিণত করেন। মুসলমানগণ হাবশায় হিজরত করার পর মক্কার কুরায়শ প্রতিনিধি দল তাঁর দরবারে পৌঁছলো এবং মুসলমানদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করার আবেদন জানালো। তাঁর সভাসদগণও কুরায়শের এ আবেদনকে সমর্থন করলো এবং মুসলমানদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করার জন্যে বাদশাহর ওপর চাপ প্রয়োগ করলো। কিন্তু নাজ্জাশী কেবল তাদের ও তাঁর সভাসদগণের আবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানই করলেন না, বরং কুরায়শের প্রতিনিধি দল যে উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলো, তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আল্লাহ তাআলা যখন আমার বাদশাহী আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার সময় উৎকোচ গ্রহণ করেননি, তখন আমি কিভাবে উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি ? আর যখন লোকেরা আমার আনুগত্য করেনি এবং আমার মুকাবিলায় আমার দুশমনের হাত মযবুত করেছে, তাই এখন আমি তাদের কথা কিভাবে মানতে পারি ?"

অতএব, প্রতিনিধি দল নিরাশ ও অকৃতকার্য হয়ে মক্কায় ফিরে এলো।

উপরোক্ত বর্ণনা কতটুকু সহীহ তা আমরা জানি না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আমাদের নেই। এ ঘটনা উল্লেখ করা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটা দেখানো যে, জাতি ও ধর্মসমূহের হাল-অবস্থা সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কত গভীর জ্ঞান ছিলো এবং কিভাবে তিনি খুঁটিনাটি কথাও তাঁর স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখতেন।

ভাষার ওপরও হযরত আয়েশার দখল ছিলো অপরিসীম। তিনি যখন বক্তৃতা করতে দাঁড়াতেন, তখন মনে হতো তাঁর মুখ হতে বাকপটুত্বের ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দরিয়া ঢেউ খেলতে খেলতে চলে আসছে। নিম্নে তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। ভাষার ওপর তার কি পরিমাণ দখল ছিলো এর থেকেই তা বুঝা যাবে।

উষ্ট্রযুদ্ধের সময় এক বক্তৃতায় তিনি তাঁর পিতার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

"আমার পিতা ছিলেন সেই সুবিখ্যাত মানব, যিনি ছাওর গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তখন আমার পিতা ছাড়া রাসূলুল্লাহর কাছে তৃতীয় যে সত্তা ছিলেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে সিদ্দীক উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে তিনিও ছিলেন আমার পিতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় তাঁর প্রতি যারপরনেই সন্তুষ্ট ছিলেন। হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পর উম্মতের নেতৃত্ব তাঁকেই সোপর্দ করা হয়েছে। সে সময় ইসলামের উচ্চ মিনারে প্রকম্পন সৃষ্টি হয়েছিলো। আমার পিতাই তা সামাল দিয়েছেন। আমার পিতাই মুনাফিকদের প্রতিরোধ করেছেন। ধর্মদ্রোহিতার উৎস বন্ধ ও ইয়াহুদীদের দুরভিসন্ধির মূলচ্ছেদ করেছেন। তোমরা তখন চক্ষু বন্ধ করে ফেতনা-ফাসাদের অপেক্ষমাণ ও হুড়-হাঙ্গামার নীরব দর্শক ছিলে। সে সময় কেবল সেই ব্যক্তিত্বই ছিলো, যিনি দীনের প্রাচীরে সৃষ্ট ছিদ্রকে মেরামত করেন। পতিতদের উর্ধে তুলেছেন। অন্তরসমূহের গোপন ব্যাধি নিরাময় করেছেন। পরিতৃপ্তদেরকে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন। তৃষ্ণার্তদেরকে পানির ঘাটে নিয়ে এসে পরিতৃপ্ত করেছেন। আর যে একবার পানি পান করেছে, তাকে পুনরায় পান করিয়েছেন।

www.pathagar.com

যখন তাঁর মাধ্যমে কপটতার মস্তক চূর্ণ করা হয়েছে মুশরিকদের মুকাবিলায় যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করা হয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সময় তিনি এমন ব্যক্তিকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন, যিনি মুসলমানদের পরম হিতাকাংখী ও প্রকৃতপক্ষেই তাদের রক্ষক ছিলেন। মুসলমানদের জন্য তাঁর অন্তঃকরণ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায় প্রশস্ত ছিলো। তিনি অনিষ্টকর শত্রুদের মস্তক চূর্ণকারী এবং অজ্ঞ লোকদের ক্ষমাকারী ছিলেন। ইসলামের পোষকতা ও সাহায্যের জন্য রাত জাগা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।

আরেক বক্তৃতায় তিনি তাঁর পিতার প্রশস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"আব্বাজান ! আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর তাঁর রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন। অন্যান্য লোক পার্থিব সম্পদ অর্জনে তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করেছে, কিন্তু আপনি সর্বতোভাবে দীনী কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। আপনি দীনকে সেই সময় দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন, যখন তাতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিলো। তাতে চিড় ধরেছিলো। তার দেয়ালসমূহ ফেটে গিয়েছিলো। বিপথগামী লোকেরা যে কাজের দিকে তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করেছে, আপনি তার থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছেন। আর যেসব কাজে তারা দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, আপনি তা সুসম্পন্ন করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, কিন্তু আপনি তাকে অতি তুচ্ছ বস্তু মনে করে ত্যাগ করেছেন। তারা দীনের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, কিন্তু আপনি তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন। তারা দুষ্টামি ও নষ্টামিতে বেড়ে চলেছে, কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকে স্বীয় ওযীফা ও আল্লাহর ভয়কে প্রাণসখা বানিয়েছেন। তারা আখিরাতকে ভুলে গেছে, কিন্তু আপনার অন্তরে সদা আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে। আপনি এক মুহূর্তের জন্যও আখিরাতকে ভুলতে পারেননি। তাদের মুকাবেলায় আপনারই কথা সমুচ্চ রয়েছে এবং যে বোঝা তারা আপনার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তা লঘু করে আপনাকে শান্তি দান করেছেন।"

মাতার ওফাতের পর তিনি তাঁর কবরের কাছে আসেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এভাবে তাঁর প্রশংসা করেন ঃ

"আল্লাহ তাআলা আখেরাতে আপনার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল রাখুন এবং দীন ইসলামের দৃঢ়তার জন্য যে মহান প্রচেষ্টা আপনি চালিয়েছেন, তার উত্তম প্রতিদান আপনাকে প্রদান করুন। দুনিয়ার প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে আপনি তাকে অপদস্থ করেছেন এবং আখেরাতকে আপনি আপনার কল্যাণময় আগমন দ্বারা

www.pathagar.com

মর্যাদাবান করে তার জন্য সম্ভ্রমের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে আপনার ইনতিকাল। আর আপনার এ দুনিয়া থেকে প্রস্থান হচ্ছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সবচেয়ে বড় মুসীবত। আল্লাহর কিতাবে মুসীবতের ওপর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য বড় বড় ইনাম ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এজন্য আমি এ বিরাট বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর ইনাম ও অনুকম্পার প্রত্যাশী হয়েছি। কান্নাকাটি ও বিলাপ-মাতম স্থলে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি যেনো আপনার ওপর শান্তি ও করুণা বর্ষণ করেন। আপনাকে তাঁর পুরস্কারের চাদরে আবৃত করেন। সুতরাং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহর সোপর্দ হে পবিত্র আত্মা ! যাঁর জীবন আমাদের জন্য আনন্দের কারণ ছিলো এবং যাঁর বিচ্ছেদ আমাদের জন্য বিরাট দুর্ঘটনার দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে।"

উপস্থিত বক্তৃতার সময় হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছোট ছোট অথচ হৃদয়গ্রাহী সমিল ছন্দোবদ্ধ বাক্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বৈবাহিক জীবনের অবস্থা বর্ণনা করার সময় সহজ-সরল পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কিন্তু ভাষার মধ্যে হৃদয়গ্রাহিতা ও অলংকার তখনো বিদ্যমান ছিলো। তিনি তাঁর রুখসতীর ঘটনা এ ভাষায় বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার বিবাহ হয়েছিলো ছয় বছর বয়সে (মক্কা শরীফে)। আমরা যখন মদীনায় হিজরত করে এলাম, তখন বানুল হারিস ইবনে খাযরাজের মহল্লায় অবতরণ করলাম। সেখানে আমার জ্বর আসতে লাগলো। ফলে, আমার মাথার সমস্ত চুল ঝরে গেলো। সাত-আট মাস পর রুখসত (বিদায়ী) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। আমি প্রথমে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। একদিন আমি আমার সখীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। তখন আমার মা উম্মু রুমান আমাকে ডাক দিলেন। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে হাত ধরে ঘরের দরযায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার শ্বাস যখন ঠিক হয়ে গেলো, তখন তিনি পানি দ্বারা আমার হাত-মুখ ধুইয়ে দিলেন। এরপর আমাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। সেখানে কিছুসংখ্যক আনসার মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা আশীর্বাদমূলক বাক্য দ্বারা আমাকে স্বাগতম জানালেন। আমার মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে দুলহিন (নববধূ) বানালেন। বেলা উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনেন। আমার মা-বাবা আমাকে তাঁর সাথে রুখসত (বিদায়) করে দিলেন। তখন আমার বয়স ছিলো নয় বছর।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাবোধ-বিচক্ষণতা, জ্ঞান-প্রতিভা লাভ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত চিত্র ওপরে তুলে ধরা হলো। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্র বিশারদ। চিকিৎসা বিদ্যায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিলো। কুলজি বিদ্যায়ও তার বেশ দক্ষতা ছিলো। কাব্য শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার দিক থেকে আরবের খুব কম লোক তাঁর সমকক্ষ ছিলো। দীনী শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকে তো কোনো ব্যক্তিকেই তাঁর মুকাবিলায় পেশ করা যায় না। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিলো। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার দিকে লক্ষ্য করলে এতে সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে না।

এমনিতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছোট বেলা থেকে বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য এ প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে আরো আলো দান করে। আর এরই ফল স্বরূপ প্রচলিত ইসলামী ও সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে স্থান লাভ করেছিলেন, তাঁর সমসাময়িক কেউ তার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেনি।

www.pathagar.com

বৈবাহিক জীবন

হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রথমা ও প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। তাঁর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর অতিবাহিত করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় অন্য কোনো বিবাহ করেননি। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ৪০ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ৬৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

নবুয়াতের দশম বছর হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড আঘাত পান। খাদীজার প্রতি তাঁর ভালোবাসা কি পরিমাণ ছিলো, তা এতেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর যত বেশী ও বিরামহীন তিনি তাঁর কথা আলোচনা করেছেন অন্য কারো তা করেননি। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের বছরটি আজ পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসে যথার্থভাবে 'শোক বছর' নামে অভিহিত হচ্ছে। কেননা, তাঁর মৃত্যুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শোক পেয়েছিলেন, তা তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও দূর হয়নি। তাঁর কথা যখন স্মরণ হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হতো এবং অত্যন্ত বেদনা ও দরদের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করতেন।

হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর কয়েক বছর পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঘটনাক্রমে এ দু'জনের মধ্যেই কিছু আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন অধ্যয়ন করলে জানা যায়, তাঁরও এ ধরনের স্ত্রীরই প্রয়োজন ছিলো। যাঁরা ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন সময় ও ধাপে জান প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করতে পারেন। সর্বতোভাবে তাঁর সাহায্যকারী সাব্যস্ত হন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম অবস্থায় লালিত-পালিত হন। পিতার মৃত্যু তো তাঁর জন্মেরও পূর্বে হয়েছিলো। কিন্তু মাতার ছায়াও বেশীদিন মাথার ওপর ছিলো না। তিনি শৈশবকালেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মতো নির্মল ও সহানুভূতিশীল মহিলাকে তাঁর জন্য মনোনীত করেন। বিবাহের পর হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে সহানুভূতি

www.pathagar.com

ও সহৃদয়তার সাথে তাঁকে সান্ত্বনা দেন, তা তাঁর সমস্ত বিপদাপদ ও দুঃখ-বেদনা নিরাময় করে দিয়েছে। যা ইয়াতীম অবস্থায় তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিলো। নবুয়াত দাবী করার সাথে সাথেই বিপদের পাহাড় রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ভেঙ্গে পড়লো। এমন কোনো উৎপীড়ন ছিলো না, যা দুশ্চরিত্র মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর চালায়নি। আর বিরোধিতার এমন কোনো উপায় ছিলো না, যা কুরায়শরা প্রয়োগ করতে ত্রুটি করেছে। এ অবস্থায় যখন মক্কার সব লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতে পরিণত হচ্ছিলো এবং তাঁর ওপর চরম নৃশংস অত্যাচার চালানো হচ্ছিলো—যদি কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তিনি ছিলেন হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি তাঁর তন-মন-ধন সবকিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেন এবং এমন সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সাথে তাঁর সেবা করেন, যার দরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন থেকে কাফেরদের যুলুম-অত্যাচারের অনুভূতি পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে ইসলাম প্রচারের কাজে নিমগ্ন থাকেন।

হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের কিছুকাল পর হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনা চলে যান। মক্কী যুগ ছিলো ইসলাম প্রচারের যুগ। এ কাজে সাহায্যদানের জন্য খাদীজার চেয়ে উত্তম বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কাউকে পাননি। মাদানী যুগ ছিলো শিক্ষা-দীক্ষার যুগ। এ কাজে তাঁর সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ তাআলা আয়েশার মতো প্রতিভাময়ী ও বুদ্ধিমতী মহিলা মনোনীত করেন। তিনি যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাতেও বুঝা যায় যে, এ বিবাহে আল্লাহ তাআলার বিশেষ অভিপ্রায় কাজ করছিলো। নীচের বর্ণনাই তার সত্যতা প্রতিপাদন করছে ঃ

বিবাহের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন ঃ আমাকে দু'বার তোমার চেহারা স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আর তা এভাবে যে, জনৈক ফেরেশতা রেশমে পেঁচিয়ে একটি ছবি আমার কাছে নিয়ে এলো এবং বললো ঃ ইনি আপনার স্ত্রী।

আমি কাপড় তুলে তোমার ছবি দেখতে পেলাম। ছবি দেখে আমি মনে মনে বললাম, এ বিবাহ যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে তিনি এর সাজ-সরঞ্জাম নিজেই সৃষ্টি করবেন।

www.pathagar.com

তখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করার কল্পনাও করেননি। এ অবস্থায় দু'বার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে স্বপ্নে দেখানো এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একথা বুঝানো যে, ইনিই আপনার হবু স্ত্রী—এটাই প্রমাণ করে যে, এ বিবাহ আল্লাহ তাআলার বিশেষ অভিপ্রায় ও ইচ্ছার প্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এমন এক সত্তাকে তাঁর রাসূলের বন্ধুত্বের জন্য মনোনীত করতে চাচ্ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য উম্মতের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে। আর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একাজটি যে উত্তমভাবেই আঞ্জাম দিয়েছেন, তা বিশ্ববাসী অবগত আছেন।

বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন কিভাবে শুরু হলো, সে সম্পর্কে কিছু হাদীসে নিম্নোক্ত বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় ঃ

হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব চিন্তিত ও বিমর্ষ থাকতেন। খ্যাতনামা সাহাবী হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থা দেখে খুব কষ্ট অনুভব করলেন। শেষে একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি বিবাহ করেন না কেনো ?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

কাকে করবো ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

আপনি ইচ্ছা করলে কুমারীও বিবাহ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বিধবাও বিবাহ করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক তথ্যানুসন্ধানের পর তিনি বললেন ঃ কুমারী আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর কন্যা আয়েশা এবং বিধবা সওদা বিনতে যামআ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু' জায়গায়ই আলাপ-আলোচনা চালোনোর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি হযরত আয়েশার মাতা উম্মু রূমানের কাছে গেলেন এবং তাঁকে আয়েশার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গাম দিলেন। উম্মু রূমান বললেন ঃ আমি আবু বকরকে জিজ্ঞেস করে জবাব দেবো। অতপর হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘরে এলেন, তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গামের কথা জানালেন। হযরত আবু বকরের ধারণা ছিলো,

www.pathagar.com

যেহেতু তাঁর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বিদ্যমান, তাই পরস্পরে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গামের কথা শুনে সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বললেন ঃ আয়েশা তো তাঁর ভাতিজী। ভাতিজীর সাথে বিবাহ কিভাবে হতে পারে ? খাওলা যখন একথা রাসূলুল্লাহকে জানালেন, তখন তিনি বললেন ঃ

আবু বকরকে গিয়ে বলো যে, তুমি আমার দীনী ভাই। আর এ সম্পর্ক বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে বাধ সাধে না।

তবু এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো না যে, আয়েশা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কারণ, তিনি পূর্ব থেকেই যুবায়র ইবনে মুতইম ইবনে আদীর সাথে (যে তখন কুফরী অবস্থায় কায়েম ছিলো) বাগদত্তা হয়েছিলেন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়াদার খেলাফ করা বরদাশত করতে পারতেন না। সুতরাং তিনি প্রথমে যুবায়রের দিক থেকে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন। তিনি তার মাতা-পিতার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বাগদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মুতইম তার স্ত্রীকে বললো ঃ

তোমার ইচ্ছা কি ?

সে হযরত আবু বকরের দিকে তাকিয়ে বললো,

আমরা যদি আমাদের ছেলেকে তোমার মেয়ে বিবাহ করাই, তবে তুমি তো আমাদের ছেলেকে 'সাবী' বানাবে না ? এবং তোমাদের ধর্মের মধ্যে তো তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না ?

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোনো জবাব দিলেন না। বরং মুতইমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

তুমি কি বলো ?

মুতইম বললো ঃ

আমার স্ত্রী যা বলেছে, তুমি তা শুনেছো। এখন তোমার জবাবের ওপর আমাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ভর করবে।

তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যুবায়রের সাথে বাগদান ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিলো না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গাম কবুল করলেন এবং হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে চারশ' দিরহামের দেন মোহরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আয়েশার বিবাহ সম্পন্ন হলো।

www.pathagar.com

বিবাহ ও পিত্রালয় থেকে বিদায়ের ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে এ বিষয়ে অবশ্যই মতভেদ রয়েছে যে, বিবাহ ও বিদায় কত বছর বয়সে হয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, পিতৃগৃহ থেকে বিদায়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স নয় বছর ছিলো। কিন্তু কারো কারো মতে নয় থেকে কয়েক বছর বেশী ছিলো।

যে জাতির মধ্যে লেখা-পড়া ও ঘটনাবলীর রেকর্ড রাখার রীতি না থাকে, তাদের মধ্যে এ ধরনের মতভেদ সৃষ্টি সাধারণত হয়েই থাকে। আর এ কারণেই আরবের খুব কম লোক এরূপ আছে, যাদের জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ ও বিবাহ তারিখ সম্পর্কে দুই-দুই, তিন-তিন রিওয়ায়াত বর্ণিত যা আছে। তাই বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকের জন্য কোনো নিশ্চিত অভিমত বলবত রাখা অতি কঠিন।

আমাদের মতে, যুক্তিসঙ্গত কথা হচ্ছে, বিদায়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স বারো থেকে কম এবং পনের বছরের বেশী ছিলো না। যেমন ইবনে সাদের কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আয়েশার বিবাহ নয় কিংবা সাত বছর বয়সে হয়েছে। রুখসত বা বিদায় অধিকাংশ বর্ণনা মতে বিবাহের পাঁচ বছর পর হয়েছিলো। এ হিসাবে বিদায় অনুষ্ঠানের সময় হযরত আয়েশার বয়স বারো থেকে পনের বছর পর্যন্তই হয়।

ছয় বছর বয়সে বিবাহ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, খাওলা বিনতে হাকীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আয়েশার বিবাহের কথা তখনই করে থাকবেন, যখন তিনি সাধারণ ধারণা অনুযায়ী বিবাহযোগ্যা হয়ে থাকবেন। একথা বুদ্ধির অগম্য যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক বালিকাকে বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন, যে চার-পাঁচ বছর পর গিয়ে বিবাহের যোগ্যা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুঃখ-বেদনা দেখে বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তার উদ্দেশ্য কখনো এরূপ ছিলো না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার-পাঁচ বছর পর আয়েশাকে বিবাহ করবেন।

এ বিষয়টির আরো একটি দিক রয়েছে আর তার দ্বারাও আমাদের মতেরই পোষকতা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশার জন্য দশ নববী সনে পয়গাম দিয়েছিলেন। এর পূর্বে তিনি জুবায়র ইবনে মুতইমের বাগদত্তা ছিলেন। যুবায়রের সাথে বাগদানের দু'টি রূপই হতে পারে। একটি এই যে, এ বাগদান বিবাহের বয়সে উপনীত হওয়ার পর কিংবা নয় বা দশ বছর বয়সে হয়েছে। কিন্তু এটা অসম্ভব। কেননা, এ সময় এ দু' পরিবারের মধ্যে

www.pathagar.com

ধর্মীয় অনৈক্য বিদ্যমান ছিলো। আর একজন মুসলমান বালিকাকে কাফেরের সাথে কোনোভাবেই বিবাহ দেয়া যেতো না। দ্বিতীয় রূপটি এই হতে পারে যে, সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী এ বাগদান শৈশবেই হয়েছে। যদি বিবাহের সময় হযরত আয়েশার বয়স ছয় বা সাত বছর ধরা হয়, তবু একথা মানতে হবে যে, যুবায়রের সাথে বাগদানও নবুয়াতের পরে হয়েছিলো। অথচ এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন। আর যুবায়র ইবনে মুতইমের পরিবার ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলো। এখন মাত্র একটি রূপই অবশিষ্ট থাকে। আর তা হচ্ছে যুবায়র ও হযরত আয়েশার বাগদান ইসলামের পূর্বে শৈশবকালে হয়েছিলো। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহের সময় তার বয়স সর্বাবস্থায়ই দশ বছরের বেশী হয়।

বাকী থাকলো এ বিষয়টি যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং তাঁর বয়স কম বলেছেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সে যুগে না লেখা-পড়ার প্রচলন ছিলো, না জন্ম-তারিখ ইত্যাদির কোনো রেকর্ড রাখা হতো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লোক মুখে যা শুনেছেন তাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সঠিক বয়স তিনি নিজেও নির্ধারণ করতে পারেননি। যেহেতু নারী চরিত্রের মধ্যে এ জিনিস অন্তর্ভুক্ত আছে যে, তার নিজের বয়স নিজের কাছে কম মনে হয় এবং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও নারী-বৈশিষ্ট্যের বিপুল অংশ লাভ করেছিলেন। তাই তিনিও বিবাহের সময় তাঁর বয়স কমই মনে করে থাকবেন। হযরত আয়েশার তো তাঁর শৈশবকালের প্রতি এতো আকর্ষণ ছিলো যে, তিনি রসিয়ে রসিয়ে সে সময়ের ঘটনাবলী আলোচনা করতেন। অনেক হাদীসের মধ্যে আমরা তাঁর মৌখিক ব্যবহৃত এরূপ বাক্য দেখতে পাই ঃ

"আমি তখন কম বয়সের বালিকা ছিলাম।"

"আমি তখন এতো ছোট ছিলাম যে, কুরআনের খুব কম অংশ আমার মুখস্থ ছিলো।"

যা হোক, আমাদের দৃঢ় অভিমত এটিই যে, পিত্রালয় থেকে বিদায়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স ১২ বছরের কম এবং পনের বছরের বেশী ছিলো না। প্রাচ্যবিদরা কম বয়সের বালিকাকে বিবাহ করার অভিযোগ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নোংরা ও কদর্য সমালোচনার শিকার বানাবার অপপ্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের পেশকৃত মতবাদ মেনে নেয়ার পর এসব সমালোচনার ভিত্তিই কায়েম থাকে না।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশার বৈবাহিক জীবন খুব সুন্দরভাবে শুরু হয় এবং তিনি মাতা-পিতার কাছ থেকে বিদায় হয়ে এক স্নেহশীল স্বামীর কোমল পরশে আসেন। তাঁর বৈবাহিক জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা এমন নেই, যা স্বয়ং তার মৌখিক বর্ণনায় সীরাত গ্রন্থ ও হাদীসসমূহে বিদ্যমান নেই। কিন্তু এসব ঘটনা অধ্যয়ন করে আমরা একটি বাক্যও এরূপ পাচ্ছি না, যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সম্পূর্ণ নতুন জীবনে পা রাখার সময় হযরত আয়েশা কোনো অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুরু থেকেই যে প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বমূলক ব্যবহার তাঁর সাথে করেছেন এবং যে স্নেহ-মমতা ও দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তার সামনে মাতা-পিতার স্নেহ-মমতা ও দয়া-আশীর্বাদও তুচ্ছ মনে হতে লাগলো।

শৈশব কাল। স্বামীর ঘরে এসেও তাঁর প্রিয় কাজ অর্থাৎ কাপড়ের তৈরি পুতুলের খেলা রীতিমতো চালু ছিলো। অনেক সময় এমন হতো যে, তিনি তাঁর সখীদের সাথে পুতুল খেলা খেলতে থাকতেন ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে আসতেন। সখীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে এদিক-ওদিক পলায়ন করতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এক এক করে ধরে আয়েশার কাছে নিয়ে আসতেন এবং বলতেন ঃ

"খেলা করো, ভয় পাচ্ছো কেন ?"

ত্রুটি-বিচ্যুতির অবস্থা এই ছিলো যে, মিথ্যাপবাদের ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁর দাসী বারীরা বর্ণনা করেন যে, আমি আয়েশার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পাই না। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই ঠিক যে, তাঁর বয়স কম। আটা ছানতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে বকরী এসে আটা খেয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আয়েশার মনোরঞ্জনের উপকরণ যোগাড় করে দিতেন। যেসব সাহাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিছক আল্লাহর রাসূল হিসাবে দেখতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য দিক তাদের কাছে অনুপস্থিত ছিলো, তারা এটা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হতেন।

একবার ঈদের দিন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশার ঘরে এলেন। তখন তাঁর কাছে দু'টি মেয়ে বসে বসে গান গাইছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছেই কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। হযরত

www.pathagar.com

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থা দেখে খুব রাগান্বিত হলেন এবং চিৎকার করে বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহর কাছে এ শয়তানী কাজ !"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখ থেকে কাপড় উঠালেন এবং বললেন ঃ

আবু বকর থামো ! ঈদের দিন। মেয়েরা একটু চিত্তবিনোদন করছে।

একবার ঈদের দিন সুদানের কিছু হাবশী মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বর্শা খেলার কসরত দেখানো শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি আয়েশাকে বললেন ঃ

"হাবশীদের খেলা দেখতে চাও ?"

তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি স্বয়ং এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন ঃ

"একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরযায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমি তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলাম। যখন ক্লান্ত হলাম, তখন তিনি বললেন, "আচ্ছা এখন যাও।"

একবার হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীগৃহের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনলেন। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন এবং এ ঔদ্ধত্যের শাস্তিদানের জন্য কন্যাকে থাপ্পড় মারতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে এরূপ করতে বাধা দিলেন। তিনি যখন বাইরে চলে গেলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশাকে বললেন ঃ

"কি মনে থাকবে ! আজ আমি তোমাকে পিটুনি থেকে রক্ষা করেছি।"

এমনিভাবে আরেকবার হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উগ্র ও চড়া কথাবার্তা বলতে শুনলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তারপর ফিরে চলে গেলেন। একটু পর যখন আবার ঘরে এলেন, তখন দেখলেন, স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমরা দু'জনে কি আমাকে সন্ধির মধ্যেও তেমনি শরীক করে নিবে, যেমনি লড়াইর মধ্যে শরীক করেছিলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "কেনো নয় ?"

www.pathagar.com

হযরত আয়েশাও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে খুব ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে তাঁর প্রতি যে ভালোবাসা ছিলো, তা খুব ভালো করে জানতেন। সৃষ্টির সেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে একাধিক বিবাহ করেছিলেন এবং আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে তিনি তাঁর সকল সহধর্মিণীর মধ্যে পূর্ণ সমতা কায়েম রাখতেন। কিন্তু ভালোবাসা ও অন্তরের ঝোঁক এক নৈসর্গিক ব্যাপার, যা সমতার মধ্যে আনা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

"হে আল্লাহ ! যে জিনিস তুমি আমার ইখতিয়ারে দিয়েছো, তার মধ্যে সমতা বিধানে আমি পূর্ণ খেয়াল রাখছি। কিন্তু যে জিনিস আমার ইখতিয়ারের বাইরে এবং তাকে তুমি তোমার নিজের হাতে রেখে দিয়েছো, সে সম্পর্কে তুমি আমাকে তিরস্কার করো না।"

হযরত আয়েশার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুরাগ ও ভালোবাসা ছিলো, হযরত আয়েশা কেবল তা যথার্থ অনুমানই করতেন না, বরং তিনি তার জন্য প্রায়শ নবীর সামনে শোকর ও সন্তোষের মনোভাব প্রকাশও করতে থাকতেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে এগার সখীর কাহিনী বর্ণনা করেন। যারা এক স্থানে একত্রিত হয়ে নিজ নিজ স্বামীর কথা আলোচনা করা শুরু করলো। কোনো রাখঢাক রাখলো না। কারো স্বামীর মধ্যে যদি ভালো কিছু পাওয়া যেতো, তবে সে তা প্রকাশ করে দিলো। আর কারো স্বামীর মধ্যে যদি মন্দ কিছু পাওয়া যেতো, তবে তা সে নিঃসংকোচে বর্ণনা করে দিলো। একাদশ সখীর নাম ছিলো উম্মু যারআ। সে তার স্বামীকে অপরিসীম ভালোবাসতো। দুনিয়ার সমস্ত সৎগুণ সে তার স্বামীর মধ্যে দেখতে পেতো। তাই তার আলোচনা অত্যন্ত প্রেমযুক্ত মধুর কণ্ঠে সে তার সখীদের সামনে প্রকাশ করলো। এ কাহিনী শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ

আল্লাহর কসম ! আবু যারআ যেরূপ উম্মু যারআর সাথে ব্যবহার করতো, আমার সাথে আপনার ব্যবহারও তদ্রূপ। বরং তার চেয়েও অতি উত্তম।

সৃষ্টির সেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীর ওপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

www.pathagar.com

দশটি বৈশিষ্ট্যের দরুন অন্যান্য পত্নীগণের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ছাড়া অন্য কোনো কুমারী নারীকে বিবাহ করেননি।

২. আমি ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রী ছিলো না, যার মাতা-পিতা উভয়ে হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

৩. আল্লাহ তাআলা আমার সাফাই আসমান থেকে নাযিল করেছেন।

৪. জিবরাঈল আমার ছবি রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন।

৫. আমি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করে নিতাম।

৬. তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম। অন্য কোনো স্ত্রী এই বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি।

৭. আমি ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীর লেহাফের (লেপ) মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হতো না।

৮. ইনতিকালের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বুকের সাথে হেলান দেয়া ছিলেন।

৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক সেদিন ইনতিকাল করেন, যেদিন আমার পালা ছিলো।

১০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার গৃহে দাফন করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ও ভালোবাসা দেখে সাহাবারাও তাদের তোহ্‌ফা সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠাতেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশার ঘরে অবস্থান করতেন।

এতে কোনো কোনো সময় নবী সহধর্মিণীদের মধ্যে মনোকষ্টও সৃষ্টি হয়ে যেতো। তাই একবার তাঁরা হযরত উম্মু সালমাকে নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করার জন্য পাঠান। তিনি সহধর্মিণীদের অভিযোগসমূহ বর্ণনা করলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। দ্বিতীয়বার আবার পাঠালেন। তখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার যখন তিনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন, তখন তিনি বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিও না। কেননা, আয়েশার লেহাফ ছাড়া আর কোনো স্ত্রীর লেহাফের মধ্যে আমার ওপর ওহী নাযিল হয় না।

হযরত ফাতেমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব স্নেহ করতেন। একবার এ ধারণা করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা কখনো রদ করেন না। নবী সহধর্মিণীগণ তাঁকে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন ঃ

আব্বাজান ! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে এ প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেনো আবু বকরের কন্যার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ

"কন্যা ! আমি যাকে পসন্দ করি, তুমি কি তাকে পসন্দ করো না ?"

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"কেনো না ?"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"আমি আয়েশাকে ভালোবাসি, তুমিও আয়েশাকে ভালোবাসো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আয়েশাকে অন্যান্য স্ত্রীর চেয়ে অধিক ভালোবাসা প্রদর্শন করা নবী সহধর্মিণীগণ সহ্য করতে পারতেন ; কিন্তু আয়েশা কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে অধিক ভালোবাসা প্রদর্শন করা সহ্য করতে পারতেন না। প্রত্যেক স্ত্রীই অন্য স্ত্রী অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে চাইতেন এবং প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকতর সান্নিধ্য লাভ করবেন। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো স্ত্রীর যদি বিশেষ কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যেতো, তবে অন্য স্ত্রীগণ তাতে ঈর্ষান্বিত হতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা হবে, সে আমার সাথে আখেরাতে সর্বপ্রথম মিলিত হবে।"

একথা শুনে সকল স্ত্রী নিজ নিজ হাত মাপা শুরু করেন এবং প্রত্যেকের আশা ছিলো তাঁর হাত যেনো সবার চেয়ে লম্বা হয়। তাহলে আখেরাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হবার সৌভাগ্য

www.pathagar.com

লাভ করবেন। সে সময় লম্বা হাতের অর্থ তারা কেউ বুঝেননি। কিন্তু হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের মৃত্যুর পর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, লম্বা হাতের অর্থ দান-সদকা ও নেক আমল। তারপর সব স্ত্রী যয়নবকে ঈর্ষা করতেন। কারণ, তিনি তাঁর নেক আমল ও দান-সদকার দরুন সবার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশার ভালোবাসার অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য স্ত্রীগণ নিঃসন্দেহে মনেপ্রাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যতখানি তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত অন্য স্ত্রীদের মধ্যে পাওয়া যেতো না। আর যে আত্মিক ও দৈহিক সম্পর্ক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আয়েশার ছিলো, তা তাঁর তুলনায় অন্য স্ত্রীদের মধ্যে খুব কম পাওয়া যেতো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাল-চলন ও আচার-আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তার কথাবার্তা শুধু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণই করতেন না, বরং তার খুঁটিনাটি পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতেন। নিম্নের এ হাদীস থেকেই তা অনুমিত হয়।

একবার কোনো এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে কথা বলতেন ?"

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য লোকদের মতো কথা বলতেন না। বরং এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলার শব্দ গণনা করতে পারতো।"

উপরে উল্লিখিত হয়েছে ঃ ভীষণ গ্রীষ্মকাল ছিলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা গরমে রক্তিম হয়ে উঠেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থায় দেখে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উরওয়া ইবনে যুবায়রের এ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন ঃ

ولو سمعوا فى مصر اوصاف خدّه + لما بذلوا فى سوم يوسف من نقد

لو احى زليخا لورآين جبينه + لاثرن بقطع القلوب على الايدى

(মিসরবাসী যদি আপনার সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনতে পেতো, তবে ইউসুফকে ক্রয় করার জন্যে কখনো তাদের পুঁজি খরচ করতো না। আর

www.pathagar.com

যুলায়খার সখীরা যদি আপনার উজ্জ্বল ললাটের জ্যোতি দেখতে পেতো, তবে হাত কাটার পরিবর্তে হৃদয় বিদীর্ণ করাকে প্রাধান্য দিতো।)

এক স্বামীর দুই বা ততোধিক স্ত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার যে মনোভাব প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে, তা হযরত আয়েশার মধ্যেও ছিলো। কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা জানার জন্য যে, তিনি তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে চলে গেলেন কিনা—তাঁর পেছনে পেছনে চলে যেতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। কিছুক্ষণ পর যখন হযরত আয়েশার চোখ খুললো এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় পেলেন না, তখন তিনি তাঁর তালাশে বাইরে বের হলেন। ঘটনাক্রমে তিনি কবরস্তানের দিকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদদের মাযারে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা তাঁর ঘরে ফিরে এলেন এবং মনে মনে বললেন ঃ

"আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক ! আপনি আপনার প্রভুর তালাশে রয়েছেন আর আমি দুনিয়ার তালাশে আছি।"

ফিরে এসে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আয়েশা, তুমি হাঁপাচ্ছো কেনো ?"

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনি ঘরে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু দুপুর রাতে উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুভূতি মোচড় দিয়ে উঠলো। আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে চলে যাচ্ছেন কিনা এ ধারণার বশীভূত হয়ে আমি আপনার পেছনে পেছনে গেলাম। কিন্তু আমি কোনো স্ত্রীর ঘরে যাওয়ার পরিবর্তে আপনাকে 'বাকী' কবরস্তানে দুআ প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করতে দেখলাম।

এরূপ ঘটনা আরো একবার ঘটেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পেছনে পেছনে বের হলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন বনে ইবাদাত করতে দেখলেন, তখন লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা জানতে পেরে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আয়েশা ! তোমার মধ্যেও প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজাণু রয়েছে ?"

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কেনো নয় ? আমার মতো স্ত্রী আপনার মতো স্বামীর ব্যাপারেও কি আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করবে না ?"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আপন সাজ-সজ্জার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। প্রায়ই হলুদ ও লাল রং-এর কাপড় পরিধান করে থাকতেন এবং সুগন্ধি লাগিয়ে তা সুবাসিত করে রাখতেন। এসব করার উদ্দেশ্য ছিলো নিছক তাঁর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

অন্যান্য স্ত্রীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ও সন্তোষলাভের জন্য যথার্থভাবেই চেষ্টিত থাকতেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এসব চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে স্থান লাভ করেছিলেন, তা অন্য কোনো স্ত্রী লাভ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর পুন্যাত্মা স্ত্রীদের কাছ থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে, তা তুলনা করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মানসিক সম্পর্ক ও নৈকট্যের যে অনুভূতি হযরত আয়েশার হাদীস থেকে হয়, তা অন্যান্য স্ত্রীদের হাদীস থেকে হয় না। এখানে প্রশ্ন হাদীসের স্বল্পতা ও আধিক্য নয়। নিঃসন্দেহে অন্য স্ত্রীদের তুলনায় হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে নিশ্চিতরূপেই অনেক বেশী হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু তার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে তাঁর বেশী সময় কাটানোর সুযোগ হতো। অবশ্য যে বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে অন্য স্ত্রীদের থেকে বিশিষ্টতা দান করে তা হচ্ছে, হযরত আয়েশার হাদীসসমূহ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপদমস্তক এতো পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে ফুটে উঠে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস-চরিত্র ও রীতিনীতির এরূপ স্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে অঙ্কিত হয়ে যায় যে, তার চেয়ে উত্তম আর সম্ভব নয়। এসব হাদীসের প্রতিটি শব্দ থেকে সেই গভীর ভক্তি, ভালোবাসা ও আন্তরিক সম্পর্কের সন্ধান মেলে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এক স্নেহশীল স্বামী ও রাসূল হিসাবে হযরত আয়েশার ছিলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও আমলকে হালকা দৃষ্টিতে দেখতেন না। বরং তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতিটি শব্দের প্রকৃত মর্ম পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা থেকে যে মর্ম হযরত আয়েশা উদ্ধার করে নিতেন, তা কারো আয়াস সাধ্য ছিলো না।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে প্রেম ও ভালোবাসার এ উচ্চস্থান হযরত আয়েশা একদিনে লাভ করেননি। বরং এ স্তর পর্যন্ত পৌছতে তাঁর এক দীর্ঘ সময় লেগেছে। বিবাহের সময় তাঁর বয়স বেশী ছিলো না। তখন তাঁর মধ্যে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বুঝবার পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো, আর না কুরআন কারীমের মূলতত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য অবগত হওয়ার ক্ষমতা। যেমন মিথ্যা অপবাদের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

"এ ঘটনার সময় আমি অল্প বয়েসী বালিকা ছিলাম, আর আমি বেশী কুরআনও জানতাম না। শুধু তাই নয়, বরং তার অজ্ঞতার অবস্থা এই ছিলো যে, নবীদের নামও সঠিকভাবে তাঁর স্মরণ থাকতো না। এ ঘটনা প্রসঙ্গেই তিনি স্বয়ং বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাকে এ অপবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন আমি আমার মুখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম উচ্চারণ করতে চাইলাম। কিন্তু তাঁর নাম আমার স্মরণ হলো না। শেষে আমি বললাম, আমিও তাই বলছি, যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা বলেছেন ঃ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ "ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই আমার সাহায্যকারী।"

তবু অজ্ঞতার এ অবস্থা বেশী দিন অব্যাহত থাকেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ তাঁকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করতে শুরু করলো এবং অবশেষে তিনি দায়িত্ব বহনের পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে গেলেন—যা আল্লাহ তাআলা উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার জন্য তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। অনেক সময় এমন হতো যে, স্ত্রীলোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে দীক্ষা গ্রহণ কিংবা দীনী মাসায়েল জিজ্ঞেস করার জন্য আসতো। তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী ও ওয়ায-নসীহতকে হৃদয়ঙ্গম করে ফেলতেন। কখনো কখনো এমনও হতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রকৃতিগত শরম ও লজ্জার কারণে মহিলাদের কোনো কোনো জিজ্ঞাসার জবাব নিজের মুখ দ্বারা দিতে চাইতেন না। তখন তিনি হযরত আয়েশাকে সেইসব মাসআলার জবাবদান ও তার ব্যাখ্যাদানের নির্দেশ দিতেন।

একবার জনৈকা আনসারী মহিলা আসমা বিনতে শিকল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নারী অপবিত্রতার দিনগুলোর পর নিজেদের কিভাবে পবিত্র করবে ?

www.pathagar.com

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"যখন স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তিনবার নিজেকে পবিত্র করবে।"

তিনি পুনরায় বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! একথাই তো জিজ্ঞেস করছি যে, কিভাবে পবিত্র করবো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"সুবহানাল্লাহ ! অপবিত্রতার অবস্থা থেকে নিজকে নিজে পবিত্র করবে।"

একথা বলে তিনি লজ্জাবশত স্বীয় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন এ অবস্থা দেখলেন, তখন ঐ মহিলার হাত ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলেন এবং তাকে মাসআলাটি পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য দ্বারা যতটুকু ফায়দা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লাভ করেছেন অন্য কেউ তা খুব কমই করেছেন। দীনী, ফিকহী, জ্ঞানগত ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তির দরুন তিনি বিশেষ-অবিশেষ সবারই শরণকেন্দ্র ছিলেন। যে ব্যক্তিই কোনো মাসআলা বুঝার ব্যাপারে সমস্যায় পড়তেন, তিনি হযরত আয়েশার কাছে আসতেন এবং পূর্ণভাবে সন্তোষ লাভ করতেন। একবার হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে লিখলেন, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি জবাব লিখে পাঠালেন ঃ

"আপনার ওপর সালাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে এ হাদীস শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাআলার সন্তোষ লাভ করতে চায়, আল্লাহ তাআলা মানুষের অসন্তোষ সত্ত্বেও স্বয়ং তিনি তার যামিন হবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তোষ লাভ করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের কাছে সোপর্দ করবেন। তারা তার সাথে যেরূপ ইচ্ছা আচরণ করবে—তার সাথে আল্লাহ তাআলার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

বস্তুত হযরত মুআবিয়ার মতো আমীর-উমারার জন্য এর চেয়ে উত্তম উপদেশ আর কিছুই হতে পারে না।

উম্মুল মু'মিনীন হিসাবে হযরত আয়েশার ওপর ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো তিনি তা পূর্ণরূপে পালন করেন। দীনের আহকাম হোক কিংবা পাক-পরিষ্কারের মাসআলাহ, রোযা-নামাযের

www.pathagar.com

আহকাম হোক কিংবা সামাজিক বিষয়-আশয়—মোটকথা, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে হযরত আয়েশার কাছে জিজ্ঞেস করা হতো, তিনি এতো সুন্দরভাবে তার জবাব দিতেন যে, জিজ্ঞেসকারী পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতেন। বহু বিষয় এমন আছে, স্ত্রীলোকেরা তা মুখে উচ্চারণ করতে ইতস্তত করে। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উম্মতের তা'লীম-তরবিয়াতের কাজ অর্পণ করা হয়েছিলো। তিনি যদি এ গুরু দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকতেন এবং স্বীয় দীনী সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের কার্যে ত্রুটি করতেন, তবে সেই আমানতের মধ্যে বাধা সৃষ্টিকারী হতেন, যা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তাঁকে সোপর্দ করা হয়েছিলো। আর এ কারণেই তাঁকে যে মাসআলা সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হতো, তিনি নির্দ্বিধায় সে সম্পর্কে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করতেন। অনর্থক লজ্জা দ্বারা কখনো ভারাক্রান্ত হতেন না। যে মাসআলা সম্পর্কে তাঁর জানা না থাকতো, তৎক্ষণাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জিজ্ঞেস করে নিতেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে মোট নয় বছর অতিবাহিত করেন। এ সংক্ষিপ্ত সময় তাঁর জন্য পরম সৌভাগ্য ও আনন্দ-স্ফূর্তি বয়ে এনেছিলো। খুব কম সৌভাগ্যবতী নারী এরূপ হয়ে থাকে, যাদের আনন্দ ও সৌভাগ্যের এরূপ সময় ভাগ্যে জুটে। নয় বছরের এ বিবাহিত জীবনে মাত্র দু'টি অপ্রিয় ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা—যা আমরা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করবো। আর দ্বিতীয় খোরপোশের মধ্যে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবীর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁর স্ত্রীদের সাথে কিছু কালের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘটনা।

অপবাদের ঘটনায় তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কারো হাত ছিলো না। বরং এটি সম্পূর্ণরূপে মুনাফিকদের দাঁড় করানো ব্যাপার ছিলো। এ ঘটনার সময়কালেও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্নত চরিত্র ও তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ পর্যবেক্ষণের একটি নতুন সুযোগ পান। বাকী থাকলো স্ত্রীদের প্রতি অসন্তোষের ঘটনা। কোনো ঘর এমন আছে, যা এ ধরনের ঘটনা থেকে মুক্ত ? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো ব্যাপারে অসন্তোষ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। দুনিয়ায় এ ধরনের হাজারো ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের ঠিক সেভাবেই সহজ-সরল জীবনযাপন করা উচিত, যেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যাপন করছেন। কেননা, তাদের

www.pathagar.com

মর্যাদা সাধারণ নারীদের মতো নয়। বরং তারা প্রতিটি ব্যাপারে অন্য লোকদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। নবীর স্ত্রীগণ যদি মানুষের সামনে অল্পে তুষ্টি ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করার আদর্শ স্থাপন না করেন, তবে নিঃসন্দেহে অন্য মুসলমানদের ওপর তার সুপ্রভাব পড়বে না। কিছুকালের অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কচ্ছেদের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে ধন-সম্পদ নিয়ে বিদায় হতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে ধন-সম্পদের অভিলাষ ত্যাগ করে আল্লাহর রাসূলের বন্ধুত্ব অবলম্বন করতে পারেন। প্রত্যেক স্ত্রী নিঃশর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুত্বকে প্রাধান্য দেন এবং ধন-সম্পদের লোভ ত্যাগ করে অভাব-অনটনের জীবনযাপন করা অনুমোদন করেন।

পত্নীত্বের সকল সুখ লাভ সত্ত্বেও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন এক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন, যা ছাড়া নারী জীবন বড় বিস্বাদ ঠেকে। আমরা সন্তানের কথা বলছি। হযরত আয়েশাও সন্তানহীনতা খুব তীব্রভাবে অনুভব করতেন। বিশেষত এ অবস্থায় যে, তিনি জানতেন হযরত খাদীজার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগাধ ভালোবাসার একটি বড় কারণ এও ছিলো যে, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তান দ্বারা সরফরাজ করেছিলেন।

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেও তিনি তাঁর দুঃখ ও বেদনা এ ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সকল সতিনের কুনিয়াত (মাতৃ পদবীযুক্ত নাম) আছে, কিন্তু আমার কোনো কুনিয়াত নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"তুমি তোমার পুত্র আবদুল্লাহর নামে স্বীয় কুনিয়াত রেখে নাও।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে যুবায়রের দিকে ইশারা করছিলেন। যিনি হযরত আয়েশার ভগ্নী আসমার পুত্র ছিলেন। হযরত আয়েশা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের নামেই উম্মু আবদুল্লাহ কুনিয়াত গ্রহণ করলেন।

সমস্ত রিওয়ায়াত এ বিষয়ে একমত যে, হযরত আয়েশার কোনো সন্তান হয়নি। এক রিওয়ায়ত মতে হযরত আয়েশার একটি ভ্রূণ নষ্ট হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সন্তানের নাম আবদুল্লাহ রাখেন এবং সেই আবদুল্লাহর নামেই হযরত আয়েশার কুনিয়াত উম্মু আবদুল্লাহ সাব্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

সন্তান থেকে বঞ্চনার অনুভূতি নারীর জন্য সাংঘাতিক কষ্টদায়ক হয়। পূর্বেই আমরা তা উল্লেখ করেছি। হযরত আয়েশারও এ নিয়ামত থেকে বঞ্চনার অনুভূতি ছিলো। পুরুষেরও প্রকৃতিগতভাবে সন্তানের কামনা থাকে। সে তার সেই স্ত্রীকে পসন্দ করে যার গর্ভে তার ঔরসে সন্তান জন্মে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো হযরত আয়েশাকে এটা অনুভব করতে দেননি যে, তিনি নিঃসন্তান। আর না এর দরুন তিনি তাঁর আদর-সোহাগে কোনো কমতি করেছেন। বরং এর বিপরীত সর্বদা স্নেহ-ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রদান করেছেন। প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-মমতার এ অকৃপণ আচরণই হযরত আয়েশার দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও সান্ত্বনার কারণ হতো।

আমি আমার "আবকারিয়া মুহাম্মদ" নামক পুস্তকেও উপরোক্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম। তার একটি অংশ আমি এখানেও বিধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি। আমি লিখেছিলাম ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশীর ভাগ স্ত্রীই নিঃসন্তান কেনো রইলেন—এ প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব দেয়া অতি কঠিন। তবু এমন কিছু ব্যাপার অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, যার দরুন মনে করা যায় যে, হয়তো এ কারণগুলোই সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ বনে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুমারী স্ত্রী ছিলেন একমাত্র হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শৈশবকালেই বিবাহ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিলো বিশ বছরের কাছাকাছি। অনেক সময় এ বয়সে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না। সন্তান প্রসবকাল এ বয়সের পর শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যারা প্রথমে অন্য স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হিনদা বিনতে উমায়্যা মাখযুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীরই তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসেও সন্তান হয়নি। উম্মু হাবীবা ও হিনদা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন এতোই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন যে, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিলো না। এ দু'জন ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীরই না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সন্তান হয়েছে, না তাদের পূর্ব স্বামী থেকে।

এর কারণ যতটা আমাদের বুঝে এসেছে তাহলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের জন্য স্বীয় স্ত্রীদের বিবাহ করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ সাধারণত দু'টি উদ্দেশ্যে হতো। কোনো কোনো

www.pathagar.com

স্ত্রীলোক তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়তো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অসহায়ত্ব ও উপায়হীনতা দূর করার জন্য তাদেরকে বিবাহ করতেন। কোনো কোনো স্ত্রীকে বিবাহ করার মধ্যে এ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গোত্রগুলোকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতেন। এটা এক প্রমাণিত সত্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রীই তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বিপদাপদের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছিলেন। কোনো কোনো স্ত্রীর হিজরতের এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিলো। আর এ সময়ের মধ্যে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশ তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নীত্ব দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার পরও তারা আনন্দোল্লাসময় জীবন লাভ করতে পারেননি। উপরোক্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে কোনো স্ত্রীলোক যদি সন্তান উৎপাদন করার অনুপযুক্ত হয়ে যান, তবে তা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

"আবকারিয়া মুহাম্মদ"-এ আমরা নবী সহধর্মিণীদের বন্ধ্যাত্বের ওপর সামষ্টিক পর্যালোচনা করেছিলাম। যেহেতু বর্তমান পুস্তকটি আমরা বিশেষভাবে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা সম্পর্কে প্রণয়ন করছি, তাই এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া এমন কিছু বিষয়েও আলোকপাত করতে চাই, যা বিশেষ করে হযরত আয়েশার সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

হযরত আয়েশার সন্তান না হওয়ার প্রথম কারণ—যা আমি আবকারিয়া মুহাম্মদ-এও বর্ণনা করেছি—এ মনে হচ্ছে যে, বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণত নারীরা সন্তানসম্পন্না হয় না। আর হযরত আয়েশার বয়স নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় বিশ বছরের কাছাকাছিই ছিলো।

সন্তান না হওয়ার একটি কারণ এও হতে পারে যে, হযরত আয়েশার শৈশব রুগ্নাবস্থায় কেটেছে। ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, দশ বছর বয়সে তাঁর জ্বর হয়েছিলো। ফলে তাঁর সব চুল ঝরে যায়। এরপরেও তাঁর স্বাস্থ্য ভালো থাকতো না। প্রায়ই তিনি রোগে ভুগতেন। তিনি তাঁর অপবাদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ (গাযওয়া বনু মুস্তালিক থেকে ফেরার পর) আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং বিরামহীন এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকি। এ সময় লোকদের মধ্যে আমার ওপর আরোপিত অপবাদের চর্চা হচ্ছিলো। কিন্তু সে সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিলো না। -- অসুস্থতার দিনগুলোতে আমি এটা অনুভব

www.pathagar.com

করতে পারছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার প্রতি পূর্বের মতো দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করছেন না। আমি খুব চিন্তাযুক্ত ছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। --- শেষে যখন আমি আমার ওপর আরোপিত অপবাদ সম্পর্কে অবহিত হলাম, তখন আমার রোগ আরো বৃদ্ধি পেলো।"

অপবাদ ঘটনার রিওয়ায়াত পাঠ করলে বুঝা যায় যে, যদি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আচানক কোনো দুঃখজনক সংবাদ পেতেন, তবে তাঁর শরীরে জ্বর উঠতো।

আমি এ বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য ডাক্তারদের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা বলেছেন, যে জ্বরের দরুন চুল ঝরে যায় এবং পরেও ক্রমাগত তা আক্রমণ করতে থাকে, তা সাধারণত ম্যালিরিয়া কিংবা টাইফয়েড হয়ে থাকে। হযরত আয়েশার ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া হওয়াই যুক্তিসম্মত মনে হয়। কেননা, হিজরতের পর এ রোগই মুহাজিরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো। হযরত আয়েশা স্বয়ং এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

যে যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় গমন করেন, সেখানকার আবহাওয়া অতি খারাপ ও নোংরা ছিলো। ফলে অধিকাংশ মুহাজির অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের দোয়ার বদৌলতে মহামারীর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মদীনার আবহাওয়া কলুষতা ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়। এ সময় আমার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ফুহায়রাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁদের শুশ্রূষা করার অনুমতি চাইলাম। পর্দার হুকুম তখনো নাযিল হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি ঐ রোগীদের শুশ্রূষা করতে গেলাম। তাঁরা ঘটনাক্রমে একই ঘরে ছিলেন। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতার কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ

"আব্বাজান ! আপনার অবস্থা কিরূপ ?"

সে সময় তার শরীরে ভীষণ জ্বর উঠেছিলো। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি এ কবিতাটি পাঠ করলেন ঃ

كل امرى مصبح فى اهله + والموت ادنى من شراك نعله

www.pathagar.com

(প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে প্রভাত করে। আর মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।)

আমি মনে মনে বললাম—"আব্বাজান কি বলছেন, তা তিনি নিজেই জানেন না।"

এরপর আমিরের কাছে গেলাম এবং তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলতে লাগলেন ঃ

لقد وجدت الموت قبل نوقه + ان الجبان حتفه من فوقه

كل امرئ مجاهد بطوقه + كالثور يحمى انفه بروقه

(আমি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনের পূর্বেই তা পেয়ে গেছি। কাপুরুষের মৃত্যু ওপর থেকে আসে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করে, যেরূপ ষাঁড় তার শিং দ্বারা আত্মরক্ষা করে।)

আমি বললাম ঃ "আমিরও হুশহারা হয়ে গেছেন।"

বিলালের যখন প্রচণ্ড জ্বর উঠতো, তখন এ কবিতা পাঠ করতেন ঃ

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة + بواد وحولى اذخر وجليل

وهل اردن يوما مياه مجنه + وهل يدنون لى شامة وطفيل-

(হায় আমি যদি জানতাম যে, এমন কোনো সময়ও আসবে, যখন আমি মক্কা উপত্যকায় রাত কাটাবো, আর আশপাশে উযখুর ও জালীল নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস থাকবে। আর হায় এমন কোনো দিনও উপস্থিত হবে, যখন মুজান্নার কুয়া থেকে পানি পান করবো এবং শামা ও তুফায়ল পর্বতমালা আমার চোখের সামনে থাকবে।)

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

"আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম এবং বললাম, জ্বরের কারণে কারো হুশ নেই। সবাই বেহুশ অবস্থায় কথা বলছেন। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমাদের অন্তরে মক্কার মতো মদীনার ভালোবাসাও বদ্ধমূল করে দাও। বরং তার চেয়েও বেশী মদীনার আবহাওয়া অনুকূল করে দাও, তার মুদ (এক সা'এর চার ভাগের এক ভাগ) ও সা' (প্রায় সাড়ে তিন সেরের

www.pathagar.com

বরাবর ওজন বিশেষ)–এ বরকত দান করো। আর তার মধ্যে সৃষ্ট জ্বর জুহ্ফায়[৩] স্থানান্তরিত করো।

ঐ মহামারীর প্রভাব হযরত আয়েশার ওপরও পড়ে এবং তিনিও ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত হন। পরবর্তীকালেও তার প্রভাব সম্পূর্ণ দূর হয়নি এবং বারবার তিনি রোগে আক্রান্ত হতে থাকেন।

আমি কয়েকজন বড় ডাক্তারের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেছি। তারা বলেছেন, ম্যালেরিয়ার কারণে গর্ভধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য নয়। হ্যাঁ, এ রোগে উপর্যুপরি আক্রান্ত হওয়ার দরুন শরীর বেশী ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়লে অন্তরায় সৃষ্টি ও গর্ভ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

আমি তাদের কাছে এও জিজ্ঞেস করেছি যে, বারবার রোগে আক্রমণ করা ছাড়াও ঘরে যদি দারিদ্র্য লেগে থাকে এবং খুব অভাব-অনটনে কালাতিপাত করতে হয়, তবু গর্ভ ধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। এসব প্রশ্ন দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কখনো ক্রমাগত তিন দিন গম কিংবা যবের রুটি পেট পুরে খাওয়া নসীব হতো না। কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই এ অবস্থা ছিলো না। বরং এ অর্ধ উপোসে তাঁর সাথে তাঁর পরিবার-পরিজনও শরীক ছিলেন।

ডাক্তারদের জবাব এটাই ছিলো যে, পরপর জ্বরের আক্রমণ এবং খাদ্যের স্বল্পতার দরুন গর্ভধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। উপরন্তু হযরত আয়েশার গর্ভপাতকেও যদি সঠিক বলে ধরা হয়, তবে এ আরেকটি দলীল হবে জ্বরের প্রভাবে গর্ভধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া ও গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার।

যা হোক, সন্তান জন্ম না হওয়ার যে কারণই ঘটুক না কেনো, এতে সন্দেহ নেই যে, তার দরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসা আদৌ হ্রাস পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শন করতেন। কখনো কখনো হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নারীসুলভ ছলনা ও কমনীয় ভঙ্গি প্রদর্শন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতার যে চুক্তি হয়েছিলো তার অবস্থা কি ?"

৩. জুহ্ফা মদীনা থেকে কিছু দূরে মক্কার দিকে অবস্থিত একটি বসতি।

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলতেন ঃ

সেভাবেই বজায় রয়েছে। একটুও হ্রাস পায়নি।"

প্রত্যেক নারী প্রকৃতিগতভাবেই চায় যে, তার স্বামী যেনো কেবল তাকেই ভালোবাসে এবং অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে তার সাথেই যেনো গভীর সম্পর্ক থাকে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং অন্যান্য নবী সহধর্মিণীদের মধ্যেও এ প্রকৃতিগত প্রেরণা নিয়ত বিদ্যমান ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা লাভের প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রত্যেক স্ত্রী অন্য স্ত্রীদের অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় তৎপর থাকতেন। যাতে কখনো কখনো পরস্পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতো। এতদসত্ত্বেও তাঁদের অন্তর থেকে এ ধারণা কখনো উধাও হতো না যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এবং তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ণ শ্রদ্ধা করা, তাঁর সন্তুষ্টিকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি হতে না দেয়া যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কোনো ত্রুটির কারণে তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কখনো যদি এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতোই, তবে তাঁরা তাঁদের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে তা শুধরে নিতেন এবং ভবিষ্যতে কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিযোগ করার সুযোগ দিতেন না।

একবার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি সবসময় খাদীজার কথা কেনো বলতে থাকেন ? সে তো একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলো। এখন তো আপনাকে আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করেছেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব লজ্জিত হলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সম্পর্কে কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করেননি। অনুরূপভাবে একবার হযরত সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সাফিয়্যা তো বেঁটে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ

"আয়েশা ! তুমি এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছো, যা সমুদ্রে মিশাতে চাইলেও মিশাতে পারবে।"

www.pathagar.com

এরপর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে এরূপ কথা আর কখনো বলেননি।

সমস্ত সহধর্মিণীর মধ্যে হযরত আয়েশার সবচেয়ে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারিণী ছিলেন যয়নব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণত সতিনদের মধ্যে যে ঈর্ষাপরায়ণতা বিদ্যমান থাকে এ দু'জনের মধ্যে তা ছিলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। না হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং না হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা কখনো কোনো এমন শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন যাতে বুঝা যায় যে, তাঁরা একে অন্যকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে হেয় করতে চাচ্ছেন। সুতরাং অপবাদ আরোপের ঘটনা সম্পর্কে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নবের মতামত জানতে চান, তখন তিনি বলেন ঃ

"আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে আয়েশার মন্দ থেকে রক্ষা করছি। আমি তার মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা বার্ধক্যে পৌছার দরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার আশংকায় (এটা তাঁর নিজস্ব আশংকা ছিলো) স্বেচ্ছায় তার পালা হযরত আয়েশাকে দান করেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এতে খুব খুশী হন এবং হযরত সাওদার প্রতি তিনি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকেন।

এসব ঘটনা অধ্যয়ন করে কোনো ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে না পৌছে পারেন না যে, প্রকৃতিগতভাবে কখনো কখনো নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে অবনিবনা সৃষ্টি হলেও তাদের দিলদর্পণ ছিলো সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং আন্তরিকভাবেই তারা একে অপরের হিতাকাংখিনী ছিলেন। প্রকৃতিকে কোনো ব্যক্তি পরিবর্তন করতে পারে না। যদি দু'জন সহোদরা বোন এক জায়গায় থাকে, তবে তাদের মধ্যেও অনেক সময় ঝগড়া-ঝাটি বেধে যায়। আর এটাতো ছিলো সতিনদের ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার ফলেই এ ব্যাপারটি নিছক পারস্পরিক অমিল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে নবী-সহধর্মিণীদের আঁচল ছিলো সম্পূর্ণ পবিত্র এবং মধ্যপন্থার সীমা তাঁরা কখনো অতিক্রম করেননি।

সতিনদের সাথে সম্পর্কের অবস্থা প্রসংগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করাও সঙ্গত মনে হচ্ছে আর তা হচ্ছে—হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থা।

www.pathagar.com

যদি বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর কন্যা ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, তবে তা ভুল হবে না। কেননা, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং বর্ণনা করছেন যে, কোনো এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে ?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ফাতেমা।

ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো ঃ পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ ফাতেমার স্বামী।

হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সন্তান হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যধিক ভালোবাসতেন। তিনি প্রায়শ তাদের সাথে খেলতেন, আদর করতেন, চুমু খেতেন এবং তাদের মনোরঞ্জনের উপকরণ যোগাতেন।

প্রথমত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার গর্ভজাত সন্তান, যাঁর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অফুরন্ত ভালোবাসা ছিলো এবং তাঁর কথা বারবার উল্লেখ করার দরুন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মনোকষ্ট অনুভব করতেন আর সে কথা একবার তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে প্রকাশ করেও ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, হযরত আয়েশার কোল ছিলো সন্তান শূন্য। তিনি যখন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সন্তানের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহ-ভালোবাসা অবলোকন করতেন, তখন তাঁর সন্তানহীনতার অনুভূতি তীব্র হয়ে দেখা দিতো। আর এ কারণেই এ দু'জনের মধ্যকার সম্পর্ক তেমন ভালো ছিলো না। এ প্রেক্ষিতেই একবার নবী-সহধর্মিণীগণ হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীগণ ও আয়েশার মধ্যে সমতা বিধান করুন। আর হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহাও এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত ফাতেমার সাথে হযরত আয়েশার মনোমালিন্যের কারণ এও হতে পারে যে, অপবাদ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতামত জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। আয়েশা ছাড়া আরো অনেক স্ত্রীলোক আছে (যাদেরকে আপনি বিবাহ করতে পারেন)।"

www.pathagar.com

মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে এ ধরনের কথাবার্তায় প্রভাবান্বিত হয়। তাই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর একথায় যদি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দুঃখ পেয়ে থাকেন, আর তার প্রতিক্রিয়া তাঁর ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু তার সাথে সাথে একথাও হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, এ মনোকষ্টো কখনও তিক্ততার রূপ ধারণ করেনি এবং উভয়ের অন্তরে অন্যের প্রতি ইয্যত ও সম্ভ্রমবোধ বলবত ছিলো।"

এ হচ্ছে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পারিবারিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র, যার ওপর দৃষ্টিপাত করলে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সাধারণ স্ত্রীদের মতো জীবন যাপন করেন। বরং শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব-ভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করে তিনি সঠিক অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-অংশীদার হওয়া প্রমাণিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত শিক্ষা যেভাবে তিনি তাঁর অন্তরে গেঁথে নেন অন্য কেউ তা পারেনি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর রেখে যাওয়া আমানত—কুরআন ও সুন্নাহকে তিনি যে সুন্দর পদ্ধতিতে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন অন্য সাহাবাদের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া অসম্ভব না হলেও সুকঠিন।

www.pathagar.com

অপবাদের ঘটনা

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটানো। এ অপবিত্র অপবাদ মুনাফিকদের পক্ষ থেকে তাঁর পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে সাজানো হয়। এ অপবিত্র অবপাদ রটানোয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিলো মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের। যে ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু। কিন্তু তার স্বদেশবাসীরা মুসলমান হওয়ার দরুন সে কিছু করতে পারতো না। সে তার মনের মালিন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ সাজানো ও অপবাদ রটানোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকতো।

এ অপবিত্র অবপাদ রটানোর সময় ফেতনাবাজ মুনাফিকরা নৈতিকতা ও শালীনতার সমস্ত সীমালংঘন করে যে কাজটি করেছে, তার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রজন্ম তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকবে। এ সময় সেই সমুদয় কারণ একত্রিত হয়ে গিয়েছিলো, যা ফেতনাবাজ লোকেরা তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য ফলপ্রসূ মনে করে এবং যার দরুন তারা সরলপ্রাণ লোকদেরকে স্বীয় দলে ভিড়িয়ে নিষ্পাপ অস্তিত্ব সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপের অভিযান শুরু করে দেয়। নিম্নে সেই কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের এ নিয়ম চলে আসছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো গুজব রটে, তবে তারা তার সত্যাসত্য যাচাই করার পরিবর্তে স্বয়ং নিজের তরফ থেকে নতুন নতুন কথা বানিয়ে গুজবের পরিধিকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে। এমনিতেই তো ছোটখাটো বিষয়কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করা হয়। কিন্তু যদি কোনো গরীবকে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে কলংকিত করা হয়, তবে এরূপ স্থলে মানুষের কৌতূহল বেড়ে যায়। আর যদি সম্ভ্রান্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা এ অভিযোগের আওতায় এসে যান, তবে সাধারণ মানুষের কৌতূহল কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আর যদি এ ধরনের নোংরা অপবাদ আরোপ করা ও তা প্রচার করার সাথে কোনো কোনো ব্যক্তির বিশেষ উদ্দেশ্য যুক্ত হয়, তবে ফেতনার মধ্যে আরো বৃদ্ধি ঘটে। আর যদি এ ফেতনার উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা উস্কে দেয়া এবং এক শ্রেণীর মনে আরেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্টি করা হয়, তবে এ অবস্থায় এ ফেতনা তার চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং তাতে গুরুতর পরিণাম সৃষ্টি হতে পারে।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর কাহিনীও এমনি ধরনের। এতেও এক পুণ্যবান পুরুষ ও এক পুণ্যবতী মহিলার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিলো। এ দুই পুরুষ ও মহিলাই অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ অপবাদ রটানোর মধ্যে খাযরাজ গোত্রের সবচেয়ে বড় নেতা ও মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের বিশেষ কিছু স্বার্থ জড়িত ছিলো। যদি তা না হতো, তবে সে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে কখনো সফল হতে পারতো না।

ইবনে সুলুলের মতো দুরাচার ব্যক্তির তুলনা ভূপৃষ্ঠের অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর। মিথ্যা, কপটতা ও চাটুকারিতা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়ানো ও ফেতনা-ফাসাদের উপায় বের করার চেষ্টা করা ছিলো তার প্রিয় কর্ম।

মদীনায় হিজরত করার পূর্বে এ ব্যক্তি ছিলো খাযরাজ গোত্রের নেতা এবং অতি উচ্চপদ ও ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মদীনায় ইসলাম বিস্তারের দরুন তার সমস্ত ইযযত-সম্মান খতম হয়ে যায়। ফলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানের শত্রু হয়ে গেলো। প্রকাশ্যে তো কিছু করতে পারতো না। মুনাফিকদের দলে শামিল হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো। একদিকে ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার প্ররোচনা দিতে লাগলো এবং অপরদিকে অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন কৌশলে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো।

অপবাদ ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে মুসলমানরা যখন বনু মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ করে মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন ইসলামী লশকর একটি কূপের কাছে যাত্রা বিরতি করলো। একবার কূপ থেকে পানি নেয়ার সময় জনৈক মুহাজির ও জনৈক আনসারের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হলো। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। বরং প্রায় সময় যখন কূপের মধ্যে পানি কম থাকে এবং পানি গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী হয় এ ধরনের ঝগড়া-ফাসাদের সৃষ্টি হয়েই থাকে। কিন্তু ইবনে সুলুল এই ঘটনাকে ভিত্তি বানিয়ে ফেতনার আগুন জ্বালানো এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করলো। সে ক্ষিপ্ত হয়ে একটি চরম নোংরা বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলো। বললো ঃ বিনা মূল্যের রুটি খেয়ে খেয়ে এখন কুরায়শদের আস্পর্ধা

www.pathagar.com

বেড়ে গেছে। খাচ্ছেও আবার ধমকাচ্ছেও। (অর্থাৎ যাদেরটা খায় তাদেরকেই ধমকায়)। আল্লাহর কসম ! আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাবো, তখন সম্মানিত ব্যক্তি 'হেয় ব্যক্তিদের বের করে দিবে। ('সম্মানিত ব্যক্তি' দ্বারা তার ইশারা ছিলো নিজের দিকে এবং হেয় ব্যক্তি' দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে) এরপর সে তার স্বগোত্রীয় লোকদের দিকে ফিরে বললো ঃ

"এসব হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের ফল। তোমরা তাদেরকে নিজেদের ঘরে জায়গা দিয়েছো। নিজেদের ধন-সম্পদ তাদেরকে ভাগ করে দিয়েছো। আর এখন কি হচ্ছে ? যদি এমনিভাবে এ ধারা অব্যাহত থাকে, তবে তোমরা দেখবে যে, একদিন এরা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেবে আর তোমরা তাদের কিছুই করতে পারবে না।"

ইবনে সুলুলের এ কলহমূলক কথাবার্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জানতে পারলেন। কিন্তু তিনি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো এবং কসম খেয়ে বললো যে, সে এ ধরনের কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করেনি।

মোটকথা, স্বীয় অকৃতকার্যতা ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চনার দরুন ইবনে সুলুলের প্রতিশোধস্পৃহা চাড়া দিয়ে উঠে এবং সে সব বৈধ-অবৈধ পন্থায় মুসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত এবং তাদেরকে হেয় দেখানোর জন্য বদ্ধপরিকর ছিলো। সুতরাং তার এ বিবাদমূলক কার্যকলাপ দেখে আওস গোত্রের এক বড় নেতা উসায়দ ইবনে হুযায়র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন যে, আপনি ইবনে সুলুলের আচরণে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। বেচারা করুণার পাত্র। আপনার মদীনা আগমনের পূর্বে মদীনাবাসী সর্বসম্মতভাবে তাকে তাদের বাদশাহ বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো এবং তার জন্য মুকুটও তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু আপনার আগমনে তার সমস্ত আশা-আকাংখা মনের মধ্যেই গুমরে মরছে এবং তার বাদশাহীর স্বপ্ন দুঃখ-বেদনায় পরিণত হয়েছে। এখন সে তার পরাজয় ও অকৃতকার্যতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ নীচ আচরণে তৎপর হয়েছে। তাকে তার অবস্থায় রেখে দেয়াই আপনার জন্য সঙ্গত হবে।

আর এ কারণেই হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো দ্বারা তার উদ্দেশ্য সাধারণ দুষ্ট লোকদের মতো নিছক এক পুণ্যবতী মহিলাকে অভিযুক্ত করা ছিলো না, বরং আসল উদ্দেশ্য ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের দুর্নাম করা। সুতরাং যখন সাফওয়ান ইবনে উমায়্যার উট —যার ওপর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সওয়ার ছিলেন—ইবনে সুলুলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলো, তখন সে জিজ্ঞেস করলো ঃ

www.pathagar.com

"এ মহিলা কে ?"

যখন তাকে বলা হলো যে, ইনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, তখন সে বললো ঃ

"ইস্ ! এই তোমাদের নবীর স্ত্রী ! যে এক পরপুরুষের সাথে রাত কাটিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর এখন ভোর হওয়ার পর সে তাকে নিজের সাথে করে নিয়ে এসেছে ?"

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের মতো অন্যান্য ইসলাম বিরোধীরাও অপবাদ ঘটনাকে ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার একটি মাধ্যম বানিয়ে রেখেছে। আর এ কাজে ইউরোপের পাদরী ও প্রাচ্যবিদরা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে চলছে। অবশ্য যেসব লোকের মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র আছে, তারা এ ঘটনাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবোধগম্য মনে করছেন। স্যার উইলিয়াম ম্যূর তাঁর গ্রন্থে লিখেন ঃ

"আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে একথা নেহাত পরিস্কার ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, তিনি এ নোংরা অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।"

কোনো কোনো ব্যক্তি বাস্তবতাকে এতদূর অতিক্রম করে গেছে যে, তারা লিখেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একদিন পর্যন্ত আলাদা থাকেন এবং এই গোটা দিনটি তিনি সাফওয়ানের সাথে কাটান। যেমন রডওয়েল (RODWELL) তাঁর কুরআনের তরজমায় সূরা আন-নূরের যে স্থানে এ ঘটনা আলোচিত হয়েছে, তার পার্শ্বটীকায় একথাই লিখেছেন।

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ যদিও ঘটনাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রতারণা ও কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে, তবু তাদের এ দুঃসাহস হয়নি যে, তারা হযরত আয়েশাকে (নাউযুবিল্লাহ) এ অভিযোগে কলংকিত করতে পারেন। কিন্তু কোনো কোনো খৃস্টান পাদরী সমস্ত সততা ও সৌজন্য-ভদ্রতা শিকেয় তুলে রেখে এ কাজটি করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কেউ কেউ তো এ পর্যন্ত লিখে ফেলেছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে অভিযোগ থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করা এবং অভিযোগকারী লোকদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয় দেখানোর জন্য সূরা আন-নূরের সেই আয়াতগুলো প্রণয়ন করেছেন, যাতে আয়েশার নির্দোষিতার বর্ণনা এবং অভিযোগ করার সময় চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করার উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

যে প্রাচ্যবিদরা এ ধরনের কলমবাজি করেছেন, তারা কুরআন কারীম সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। যদি নারীকে অপবাদ দেয়ার সময় চারজন সাক্ষী পেশ করার কথা কেবল সূরা আন নূরেই উল্লেখ করা হতো, তখন ঐ প্রাচ্যবিদদের জন্য আপত্তি করার কোনো সুযোগ হতো। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন, তিনি জানেন যে, সূরা আন নিসাতেও ব্যভিচারের অভিযোগে চারজন সাক্ষী পেশ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ـ(النساء : ١٥)

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫)

একথা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত যে, সূরা আন নিসার এ আয়াতগুলো সূরা আন নূরের বহু পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। আর তখন কোনো ব্যক্তি একথা কল্পনাও করতে পারেনি যে, আগামীতে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপর এ ধরনের অপবাদ আরোপ করা হবে। অতএব একথা বলা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিছক আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বাঁচানোর জন্য চারজন সাক্ষীর শর্ত অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন—এটা এমন এক অপবাদ, যার দ্বারা অপবাদ আরোপকারীদের জ্ঞানগত অজ্ঞতা জাহির হয়ে যায়।

কোনো কোনো পাদরী একথাও বলেছেন যে, যখন মুসলমান বানু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন অন্ধকার রাত ছিলো এবং অন্ধকার রাতে একটি হারানো হার তালাশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু একথাও সুস্পষ্ট ভুল। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২রা শাবান যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতভাবেই চাঁদনী রাতে হয়েছিলো। তাছাড়া, যদি এ দিনগুলোতে অন্ধকার রাতই হতো, তবে মুনাফিকরা—যারা পাদরীদের মতো সমালোচনার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতো না, তাদের অপবাদ রটানোর সময় একথাটিও অবশ্যই বর্ণনা করতো। কিন্তু আমরা এ

www.pathagar.com

ধরনের কোনো বর্ণনা পাইনি, যাতে একথা প্রকাশ পায় যে, মুনাফিকদের তরফ থেকে তাদের অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ একথাও পেশ করা হয়েছিলো।

বস্তুত আমরা যেদিক থেকেই দেখি না কেনো, এ অভিযোগের আপাদমস্তক অসত্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকমের সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট থাকতে পারে না। আমরা জানি না, তারা কোন্ ধরনের মানসিকতার অধিকারী ছিলো—যারা এ অপবাদ রটনার কাজে অংশ নিয়েছিলো। আমাদের বুঝে আসে না, তারা কিভাবে এটা বিশ্বাস করলো যে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক এতো স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং তাদের বিচার-বুদ্ধি এতো অন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা তাদের পক্ষ থেকে পেশকৃত সব রকমের বাহুল্য কথাই মেনে নিতে প্রস্তুত হবে। এ অপবাদ রটনাকারীদের কথা বাদ দিয়ে বর্তমান ইসলাম বিরোধী মহলের বিচার-বুদ্ধির দিকে তাকালেও আশ্চর্য হতে হয় যে, তারা কোন্ জিদের বশবর্তী হয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও বাস্তব সত্যসমূহকে অসত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় নিরত হয়েছে। অথচ তারা যদি তাদের বিচার-বুদ্ধিকে সামান্যতমও কাজে লাগতো, তবে তারা এ সত্য অবশ্যই অবগত হতে পারতো যে, কোনো লক্ষণই এমন পাওয়া যায় না, যার দ্বারা এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। এ অভিযোগ একটি নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার। কোনো সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষেই জ্ঞাতসারে এ মিথ্যার ওপর আবরণ টানা এবং তাকে সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা শোভা পায় না। এটা এক ভয়াবহ কুধারণা। কোনো মানুষের পক্ষেই এর দ্বারা নিজকে কলুষিত করা ঠিক নয়। এক পুণ্যবতী নারীকে নোংরা অপবাদ দান। কোনো ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্যও এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন এজন্য নয় যে, এ ব্যাপারটি এতোই সন্দেহজনক ছিলো যে, আল্লাহ তাআলার সাফাই ব্যতিরেকে তা পরিষ্কার হতে পারতো না। বরং এজন্য যে, ভবিষ্যতে যদি কোনো নির্দোষ নারীর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি ঘটে, তবে মানুষ যেনো চিন্তা-ভাবনা না করে অভদ্র ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের পেছনে না ছুটে। বস্তুত হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আঁচল এতোই পবিত্র ছিলো যে, কোনো সভ্য-শিষ্ট ও সুরুচিসম্পন্ন অমুসলিমের পক্ষেও তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ হতে পারে না। তাই তাঁর নির্দোষিতা সম্পর্কে আসমান থেকে ওহী নাযিল হওয়ারও কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

মোটকথা, এ কদর্য অপবাদ থেকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় দলীল হচ্ছে, এ অপবাদের সপক্ষে একটি তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর ও দুর্বল থেকে দুর্বলতর প্রমাণও পেশ করা যাবে না।

www.pathagar.com

অপবাদ রটানোর এ ফেতনা বানু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে শুরু হয়। রওয়ানা দেয়ার অব্যবহিত পর এমন লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের হিংসাপরায়ণতা ও বিদ্বেষ-শত্রুতা অবশ্যই উদ্‌গীরিত হবে। ঐ ব্যক্তির ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরিসীম অনুগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তার প্রতিদান সে এই দেয় যে, সর্বদা মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া হতে দেয়নি। হিংসাপরায়ণতা ও ধোকা-প্রতারণায় তার জুড়ি ছিলো না। আর ষড়যন্ত্র ও অপবাদ রটানোর ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি ছিলো অনন্য।

সর্বপ্রথম এ ঘটনা ঘটে যে, এক স্থানে মুসলমানগণ ছাউনি ফেলে। অদূরেই একটি কূপ ছিলো। লোকেরা সেখানে পানি আনার জন্য যায়। হঠাৎ এক মুহাজির ও আনসারীর মধ্যে পানি নেয়ার সময় পরস্পর কিছু উষ্ণ কথাবার্তা হয় এবং উভয়ই জাহেলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী নিজ নিজ গোত্রকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়। এ আহ্বান শুনা মাত্রই উভয় দল হাতিয়ার নিয়ে কূপের কাছে পৌঁছে যায়। তরবারি কোষমুক্ত হওয়ার উপক্রম হলো। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন। তিনি তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। উভয় দলকে সমবেত করে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, তোমরা আমার সামনেই জাহেলিয়াতের কথাবার্তা পুনরাবৃত্ত করা শুরু করেছো ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শুনে কুরায়শ ও আনসার উভয়ে তাদের ভুল বুঝতে পারলো। ভবিষ্যতে সাবধান থাকার ওয়াদা করলো। সুতরাং ব্যাপারটির এখানেই রফা-দফা হয়ে গেলো।

এ ঘটনা বাহ্যত খুব সাধারণ ছিলো এবং পরে তা কেউ মনেও রাখতো না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এ সুযোগটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করলো এবং এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সে খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা শুরু করে দিলো। যার সাথেই তার দেখা হতো, তাকেই থামিয়ে বলতো ঃ

"তোমরা আমাদের সাথে আজ থেকে অধিক অপমানজনক ব্যবহার কি কখনো হতে দেখেছো ? আল্লাহর কসম ! আপন গোত্রের অপমান দেখে আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আচ্ছা ! লশকরকে মদীনায় নিয়ে যেতে দাও। সেখানে পৌঁছে সম্মানিত ব্যক্তি হেয় ব্যক্তিদের শহর থেকে বের করে দেবে।"

www.pathagar.com

এরূপ আস্ফালন করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, বরং নিজ সাথীদেরকে বলতে লাগলো ঃ

"তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার পরিণাম দেখতে পেয়েছো। তোমরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপন জান কুরবান করে দিয়েছো। স্বীয় সন্তান-সন্ততিদের ইয়াতীম ও স্ত্রীদের বিধবা বানিয়েছো। তোমরা সংখ্যায় অধিক ছিলে। কিন্তু ক্রমশ তোমাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে চলছে। কুরায়শ কম ছিলো। কিন্তু তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তোমাদের বাঁচার মাত্র একটি মাধ্যম আছে। আর তা হচ্ছে, এখন তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথীদের জন্য কিছু ব্যয় করবে না। এটা দেখে ক্রমে ক্রমে সব লোক মুহাম্মদের সংস্রব ত্যাগ করবে আর তোমরা এক বিরাট বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলের এ অশান্তি সৃষ্টিকারী বক্তব্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অবগত হলেন। দুপুরের সময়। প্রচণ্ড গরম পড়ছিলো। কিন্তু তিনি এ খবর শুনামাত্রই তৎক্ষণাৎ লশকরকে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। উসায়দ ইবনে হুযায়র নামক জনৈক সাহাবী বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা তো বড়ই অসময়। এ সময় তো আপনি কখনো কোথাও যাত্রার নির্দেশ দেন না। আজ নতুন কি ঘটনা ঘটলো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তুমি শুনতে পাওনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল কি বলেছে ?"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক লশকর যাত্রা শুরু করলো। তিনি বারবার উটনীকে কশাঘাত করতেন। যাতে তা দ্রুত চলে। এভাবে দিনের শেষ প্রহর এসে গেলো। কিন্তু তিনি তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং রাতেও কোথাও যাত্রা বিরতি করা সমীচীন মনে করলেন না। পরদিন সকালে যখন সূর্যের কিরণ লশকরের ওপর পড়া শুরু করলো, তখন তিনি লোকদেরকে ডেরা ফেলতে অনুমতি দিলেন। লোকজন এমনিতেই ক্লান্ত ছিলো। সওয়ারী থেকে অবতরণ মাত্রই মাটিতে শুয়ে পড়লো।

যখন পুনরায় যাত্রা শুরু হলো, তখন প্রবল ধূলিঝড় চলতে লাগলো এবং লশকর ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দিলো। এদিকে কারো কারো মনে এ ভীতিও সৃষ্টি হলো যে, উয়ায়না ইবনে হিস্ন মুসলমানদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ সময় মদীনা আক্রমণ করে না বসে। কেননা, তার ও মুসলমানদের মধ্যকার সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থার দরুন লশকর খুব ত্বরিতগতিতে চলা শুরু করলো এবং অতি দ্রুত মদীনার কাছে পৌঁছে গেলো।

www.pathagar.com

মদীনার কিছু দূরে থাকতেই সূর্য ডুবে গেলো এবং অন্ধকার রজনীর কারণে লশকরকে একটি ময়দানে তাঁবু ফেলতে হলো। শেষ প্রহরে যখন পুনরায় যাত্রা করার প্রস্তুতি শুরু হলো, তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিলো। তিনি কাফেলা থেকে কিছু দূরে চলে গেলেন। ফিরে আসার পর জানা গেলো যে, তাঁর গলার হার কোথাও ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তিনি সেটি খোঁজার জন্য আবার কাফেলা থেকে বাইরে চলে গেলেন। অন্ধকার রাতে একটি ছোট্ট হার তালাশ করা খুব কঠিন কাজ ছিলো। তাঁর অনেক সময় লেগে গেলো। ইত্যবসরে হাওদা উত্তোলনকারীরা এই মনে করে যে, তিনি তাঁর হাওদার মধ্যেই আছেন—সেটি উঠিয়ে উটের ওপর রেখে দিলো এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো। যেহেতু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হালকা-পাতলা ছিলেন, তাই হাওদা হালকা হওয়া সত্ত্বেও তাদের এটা সন্দেহও হয়নি যে, তিনি তার মধ্যে নেই।

হার তালাশ করে যখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফিরে এলেন, তখন কাফেলা চলে গিয়েছিলো। তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই মনে করে সেখানে পড়ে রইলেন যে, যখন কাফেলার লোকেরা তাঁর হাওদার মধ্যে না থাকার কথা জানতে পারবে, তখন তারা তাঁকে নেয়ার জন্য সেখানে ফিরে আসবে। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি লশকরের পড়ে থাকা জিনিসপত্র তুলে আনার জন্য লশকরের পেছনে পেছনে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্বয়ং এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এর বড় কারণ ছিলো, তিনি ছিলেন ঘুম-কাতুরে লোক। লশকর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পরও তার চোখ খুলতো না। তিনি রীতিমতো গাফলতের নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকতেন। একবার তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগও করেছিলো যে, আমার স্বামী ঘুমিয়ে থাকেন এবং ফজরের নামাযের জন্যও গাত্রোত্থান করেন না। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ানের অভ্যাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, যখন তার চোখ খুলবে, তখন নামায আদায় করবে।

এখানে একথা প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, সাফওয়ানের স্ত্রী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করার উদ্দেশ্য ছিলো মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলা যে, 'আমার প্রতি সাফওয়ানের কোনো আকর্ষণ নেই এবং সে আমার কাছে কখনো আসে না।' যেহেতু সে লজ্জার কারণে একথা প্রকাশ্যে মুখে উচ্চারণ করতে পারতো না, তাই সে সাফওয়ানের গভীর নিদ্রার কথা বলে স্বীয় অভিযোগটি নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইশারায় প্রকাশ করে দিলেন। সাফওয়ানের নিজের বর্ণনা থেকেও এ বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি যখন লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে কানাঘুষা করতে শুনলেন, তখন কসম খেয়ে বললেন যে, আমি আজ পর্যন্ত কোনো নারীর কাঁধ থেকে কাপড় তুলিনি।

বেলা উপরে উঠার পর যখন সাফওয়ান সজাগ হলেন, তখন তিনি দূর প্রান্তরে একটি কালো বস্তু পড়ে থাকা দেখলেন। কাছে এসে বুঝতে পারলেন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি উচ্চস্বরে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন। ইন্না লিল্লাহ পাঠ করা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ আওয়াজ শুনে জেগে উঠবেন। আর কথা বলার প্রয়োজন হবে না। সাফওয়ানের আওয়াজ শুনে হযরত আয়েশার চোখ খুলে গেলো। সাফওয়ান তাঁর উট কাছে এনে বললেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন ! আরোহণ করুন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উটের ওপর আরোহণ করলেন। সাফওয়ান উটের রশি ধরে লশকরের পিছে পিছে রওয়ানা হলেন এবং দুপুরের সময় তাদের সাথে মিলিত হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন এ ঘটনা অবগত হলো, তখন তার ফেতনা সৃষ্টির আরেকটি সুযোগ হাতে এলো। সে পূর্বেই জনৈক মুহাজির ও আনসারের সামান্য ঝগড়া থেকে ফায়দা উঠিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো ও সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালানোর ঘৃণ্য অপচেষ্টা করেছিলো। এ কদর্য অপবাদ রটানো তো সে পথিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলো। কিন্তু মদীনা পৌছার পর এ ফেতনা সংগঠিত প্রোপাগাণ্ডার রূপ ধারণ করলো। মুনাফিকরা জোরেশোরে এ অপবাদ প্রচার করা শুরু করে দিলো।

এ ফেতনা বিস্তারের দ্বারা মুনাফিকদের তিনটি উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মনোভাব উস্কে দেয়া। তৃতীয়ত, আনসার এবং বিশেষত খাযরাজ ও কুরায়শের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে প্রথমোক্তকে ইসলাম ত্যাগ করানো।

স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মুখ দিয়েই এ ঘটনাটি বিবৃত করানো শ্রেয় মনে হচ্ছে। কেননা, যেরূপ বিস্তৃতভাবে স্বয়ং তিনি তা বর্ণনা করেছেন অন্য কোনো সাহাবী বা রাবী তা করেননি। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

বানু মুসতালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগমন করে আমরা মদীনায় পৌছার পর আমি এক মাস অবধি অসুস্থ থাকি। এ সময় লোকদের মধ্যে মুনাফিকদের রটানো কথাবার্তার চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলাম না। তবে আমি এটা অবশ্যই অনুভব করতাম যে, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের মতো মনোযোগ নেই। আমার মা যখন আমার শুশ্রূষায় নিয়োজিত হতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে আগমন করতেন এবং সামান্য কুশল জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। এ অবস্থা দেখে আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগতো। (মনে মনে ভাবতাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে পূর্বের মতো স্নেহের ব্যবহার কেনো করছেন না। একদিন এ অসুস্থ অবস্থায়ই উম্মে সাতাহর সাথে প্রাকৃতিক কাজে বাইরে বের হলাম। উম্মে সাতাহ ছিলো আমার পিতার খালাত বোন। পথের মধ্যে তার পা চাদরে পেঁচিয়ে পড়লো। তার মুখ থেকে সহসা এ বাক্য বেরিয়ে এলো ঃ

"সাতাহ ধ্বংস হয়ে গেছে !"

আমি বললাম, ছিঃ তুমি কত খারাপ কথা নিজ মুখ দিয়ে বের করছো। এমন মানুষকে অভিশাপ দিচ্ছো, যে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলো। সে বললো, আরে সরল-সোজা মেয়ে ! তুমি শুনোনি সে কি বলছে ? আমি বললাম, সে কি বলছে ?

তখন তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আমার সম্পর্কে মুনাফিকরা কি কি অপবাদ রটনা করছে, তার বর্ণনা দিলেন। একথা শুনে আমার অসুখ বেড়ে গেলো। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। রাত এমন অবস্থায় কাটালাম যে, না এক পলকের জন্যও আমার চোখ থেকে অশ্রু থামলো, আর না চোখে তন্দ্রা এলো। ভোর বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন এবং সালামের পর নিয়ম মাফিক জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি ? আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার আব্বা-আম্মার ঘরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। কেননা, তাঁদের কাছ থেকে আমি বিস্তারিত ও নিশ্চিত হাল-অবস্থা অবগত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিলেন। আমি আমার আব্বা-আম্মার ঘরে এসে গেলাম। তখন আমার আম্মা উম্মে রূমান ঘরের নিচতলায় ছিলেন আর ওপর তলায় আমার আব্বা আবু বকর কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করছিলেন। আমার আম্মা আমাকে দেখে বললেন ঃ তুই এ অসুস্থ অবস্থায় কেনো চলে এসেছিস ? আমি বললাম ঃ আমার সম্পর্কে লোকেরা যেসব কথা রটনা করছে, আপনি তা

www.pathagar.com

শুনতে পেয়েও আমাকে কেনো তার একটি শব্দও বলেননি ? তিনি বললেন ঃ বেটি ! মনে কষ্ট নিস্‌না। কোনো সুন্দরী নারী যদি এমন কোনো পুরুষের স্ত্রী হয়, যে তাকে খুব ভালোবাসে আর তার যদি সতিনও থাকে, তবে অনেক সময় তার সম্পর্কে এরূপ খবর রটেই থাকে।" একথা শুনে আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। আমার ক্রন্দনের শব্দ শুনে আব্বা নিচে নেমে এলেন এবং আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওর কি হয়েছে ? তিনি জবাব দিলেন ঃ ও সেই কথা জেনে ফেলেছে, যা ওর সম্পর্কে রটনা করা হচ্ছে। একথা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। দু'টি রাত আমার অনবরত কাঁদতে কাঁদতেই চলে গেলো। আমার আব্বা-আম্মা সর্বক্ষণ আমার কাছে বসে রইলেন। তাঁদের ধারণা ছিলো কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা ফেটে যাবে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন এবং সালাম করে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি বললেন ঃ "আয়েশা ! আমার কাছে তোমার সম্পর্কে এরূপ কথা পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে স্বয়ং তোমার সাফাই নাযিল করবেন। আর যদি তুমি বাস্তবিকই এ দোষে কলুষিত হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তাআলার কাছে ইসতিগফার ও তাওবা করো। কেননা, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার এতো দিনকার প্রবহমান অশ্রু হঠাৎ থেমে গেলো। আমার মনে হলো আমার চোখে কোনো অশ্রু ছিলই না। আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, আমার কিছুই বুঝে আসছে না, আমি কি জবাব দিবো ? তখন আমি আম্মাকে বললাম, আপনি জবাব দিন। তিনিও তাই বললেন, আমার বুঝেও কিছু আসছে না। এরপর আমি বললাম ঃ

"আপনারা এ ব্যাপারটি এতো পারম্পর্যের সাথে শ্রবণ করেছেন যে, তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নির্দোষ আর আল্লাহ তাআলাও অবগত আছেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি কোনো দোষ স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম ! আমি একথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবো না, যা ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা বলেছিলেন। অর্থাৎ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ "ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়, আর আল্লাহ-ই আমার সাহায্যকারী।"

www.pathagar.com

এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার এ ধারণা ছিলো না যে, আল্লাহ তাআলা আমার সম্পর্কে ওহী নাযিল করবেন। বরং এ বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কোনো স্বপ্ন দেখাবেন যাতে আমার নির্দোষ হওয়া প্রকাশ হয়ে যাবে। এ সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু এতটুকুই বললেন ঃ "আরবের কোনো পরিবারকেই এতখানি অপমান সহ্য করতে হয়নি, যতখানি আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। আল্লাহর কসম ! জাহেলিয়াত আমলেও আমাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলা হয়নি, যা ইসলাম গ্রহণের পর বলা হচ্ছে।"

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার অবস্থা প্রকাশিত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজকে নিজে একটি কাপড়ের মধ্যে লেপ্টে নিলেন। আর আমি তাঁর মাথার নিচে চামড়ার একটি বালিশ রেখে দিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই এ অবস্থা কেটে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসছিলেন এবং মুক্তোর মতো স্বেদবিন্দু তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঝরে পড়ছিলো। তিনি তা মুছে ফেললেন এবং মুখ দিয়ে প্রথম এ বাক্য বের করলেন ঃ "আয়েশা ! আল্লাহ তাআলা তোমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন।"

আম্মা একথা শুনে আমাকে বললেন ঃ "উঠে দাঁড়াও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুকরিয়া আদায় করো।" আমি জবাব দিলাম, আমি দাঁড়াবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো শুকরিয়াও আদায় করবো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কামিজ ধরতে চাইলেন, কিন্তু আমি তা ধরতে দিলাম না। এ দৃশ্য দেখে আমার আব্বা জুতা নিয়ে আমাকে মারার জন্য উঠলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে থামিয়ে দেন এবং মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ দিনগুলোতে ভীষণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর বুঝে আসছিলো না কি করা উচিত। তিনি সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আয়েশাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে কে আবদ্ধ করিয়েছিলেন ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, "আল্লাহ তাআলা।" হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা আয়েশার ব্যাপারে আপনার সাথে (নাউযুবিল্লাহ) প্রতারণা করেছেন ? আল্লাহর কসম ! এসব হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এক বিরাট অপবাদ, যা আয়েশার

www.pathagar.com

উপর আরোপ করা হচ্ছে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পর তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করার ব্যাপারে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করলেন। উসামা ইবনে যায়েদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি আপনার স্ত্রী, আপনার ইচ্ছাই প্রবল। কিন্তু আমরা তো জানি, তিনি সতী ও পুণ্যবতী। আমরা তো তাঁর মধ্যে মন্দ কিছু দেখতে পাই না। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ তাআলা আপনার উপর কোনো প্রকার সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া আরো অনেক স্ত্রীলোক আছে (যাদেরকে আপনি বিবাহ করতে পারেন)। তবে আপনি যদি প্রকৃত ব্যাপার অবগত হতে চান, তাহলে দাসীর (বারীরা) কাছে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বারীরা ! তুমি কি তোমার মালিকার কোনো মন্দকার্য সম্পর্কে অবগত আছো ? সে জবাব দিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সেই সত্তার কসম ! যিনি আপনাকে সত্য ও সততার সাথে প্রেরণ করেছেন। আমি আজ পর্যন্ত আয়েশার মধ্যে কোনো প্রকার খারাবী দেখিনি। শুধু একটি দোষ ছাড়া। আর তা হচ্ছে, সে অল্প বয়েসী মেয়ে। আটা ছানা বাদ দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে বকরী এসে তা খেয়ে যায়। অথচ সে তার খবরও রাখে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে যয়নব বিনতে জাহাশের মতামতও জিজ্ঞেস করেন—যিনি আয়েশার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, "আমি তাই বলবো, যা আমার কান শুনেছে এবং চোখ দেখেছে। আমি আয়েশাকে সম্পূর্ণ সতী-সাধ্বী মনে করি।"

মুনাফিকদের এ ফেতনাবাজিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট হচ্ছিলো। শেষে একদিন তিনি মেম্বরের উপর উঠে বললেন ঃ

"ঐসব লোকের কি হয়েছে, যারা আমার পরিবার-পরিজনের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা এমন একজন লোককে অভিযুক্ত করেছে, যে সচ্চরিত্রবান—আমার অনুপস্থিতিতে কখনো আমার গৃহে প্রবেশ করেনি এবং সফরের সময় সর্বদা আমার সাথে থেকেছে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা শুনে আওস গোত্রের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি উসায়দ ইবনে হুযায়র দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

www.pathagar.com

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এসব লোক যদি আওস গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে, তবে আমরা নিজেরাই তাদের শাস্তিদানের জন্য যথেষ্ট। আর যদি তারা আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের হয়ে থাকে, তবে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে যে আদেশ করবেন আমরা তাই তামিল করবো। আমাদের মতে তারা শিরশ্চেদ করার উপযুক্ত।"

তখন খাযরাজ গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে উবাদা তীর বেগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন ঃ

ইবনে হুযাইর ! তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি কখনো তাদের শিরশ্চেদ করতে পারবে না। একথা তুমি এজন্য বলেছ যে, তারা খাযরাজ গোত্রের লোক। যদি তারা তোমাদের আওস গোত্রের লোক হতো, তবে তুমি কখনো এরূপ কথা বলতে না।"

এরপর আওস ও খাযরাজের লোকদের মধ্যে গালিগালাজ আরম্ভ হয়ে গেলো। যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে দিলেন এবং লোকজন নিজ নিজ ঘরে চলে গেলো।

অপবাদ ঘটনা সম্পর্কে যেসব রিওয়ায়াত হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে এবং অমুসলিম লোকেরা এ সম্পর্কে যাকিছু লিখেছে, আমরা তার সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলাম। এটি পাঠ করে তারা নিজেরাই অনুমান করতে পারেন যে, এ অপবাদের ভিত্তি কি ছিলো। প্রকৃতপক্ষে এ অপবাদের মাধ্যমে শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ঘটানোই উদ্দেশ্য ছিলো। অন্যথায় এ কাহিনী এতোই অবাস্তব, অযৌক্তিক ও আপাদমস্তক অসত্য ও মিথ্যাচারের সমষ্টি ছিলো যে, তার ওপর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিশ্বাসস্থাপন করতে পারতো না। সাহাবা কেরামের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। প্রকৃত ঘটনা এর বেশী ছিলো না যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সফরের সময় ঘটনাচক্রে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। আর তাও এজন্য যে, বাহিনী হঠাৎ রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। আর সফরের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যদি নিছক এ কারণেই সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তবে তো প্রত্যেক সেই স্ত্রীলোকের ওপরই অপবাদ আরোপ করা সহজ যে কোনো কারণে সফরের সময় পেছনে পড়ে যায়। যদি তাই হয়, তবে তো কোনো নারীরই মান-সম্মান রক্ষিত হতে পারে

www.pathagar.com

না এবং অসৎ প্রকৃতির লোকেরা তাদের বিরোধিতাকারীদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের মান-সম্মান অনায়াসে ধূলিসাৎ করে দিতে পারবে।

যেসব লোক এ ধরনের অবাস্তব ও ফালতু ব্যাপারে বিশ্বাসস্থাপন করে, তাদের উচিত নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো। এ ধরনের অভিযোগ চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। যে পর্যন্ত সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা অভিযোগ পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হবে, তখন পর্যন্ত সে সম্পর্কে একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করা কবীরা গোনাহের শামিল। মুনাফিকদের অভিযোগে যদি এতটুকুও সত্যতা থাকতো, তবে কোনো না কোনো লক্ষণ এরূপ বিদ্যমান থাকা উচিত ছিলো যার দ্বারা এ অভিযোগের সত্যতা বিশ্বাস করা যেতো। কিন্তু সহস্র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা একটি দুর্বল দলীলও তাদের অভিযোগের সপক্ষে পেশ করতে পারেনি।

আমরা সেই অমুসলিমদেরকেও–যারা এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করছেন—সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, তারা যদি এ ঘটনাকে সঠিক মনে করেন, তবে তাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে (নাউযুবিল্লাহ) নৈতিক চরিত্র ও ঈমান থেকে মুক্ত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত শিক্ষাসমূহকে অস্বীকারকারী ও তা পরিত্যাগ-কারী ছিলেন। কিন্তু এ সত্যে কার সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমান ও ইয়াকীনের উচ্চতর স্থানে সমাসীন ছিলেন এবং মনের কোনো কোণায়ও এ কল্পনা আসতে পারে না যে, তাদের থেকে এ ধরনের ক্রিয়াকাণ্ড প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

সাফওয়ান একজন আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের অপমানকে কোনো অবস্থায়ই বরদাশত করতে পারতেন না। তিনি তাঁর ঈমানী মর্যাদার প্রথম প্রমাণ দেন তখন, যখন বানু মুসতালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একটি কূপ থেকে পানি তোলার সময় মুহাজির ও ইবনে সুলুলের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে হাসসান ইবনে সাবিত সাফওয়ানকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেন। আর তার প্রেক্ষিতেই ইবনে সুলুল অপবাদ রটানোর মতো বিশ্রী ঘটনার জন্ম দিয়েছে। তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অবশেষে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন। হাদীসের কিতাবসমূহে একটি রিওয়ায়াতও এরূপ পাওয়া যায় না যা থেকে তাঁর সম্পর্কে নিন্দার কোনো দিক বেরিয়ে আসে। এরূপ নেক ও পুণ্যবান মানুষের ওপর অপবাদ আরোপ করা সেরূপ লোকেরই কাজ ছিলো, যাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার ভয় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছিলো।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে তো কোনো পাপিষ্ঠ লোকই একথা বলতে পারে যে, তাঁর অন্তর ঈমানের নূর থেকে শূন্য ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর প্রেম শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিলো। তাঁর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দের ওপর তাঁর পূর্ণ ঈমান ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর মুসলমানদের সক্রিয় রাজনীতি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহে শরীক হওয়ার সুযোগ তার ঘটে। তাঁর যদি (নাউযুবিল্লাহ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও শিক্ষার ওপর ইয়াকীন ও ঈমান না থাকতো, তবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে হেয় করার জন্য অনায়াসেই এমন এমন হাদীস প্রণয়ন করে নিতেন, যার দ্বারা ঐ বিরুদ্ধবাদীদের হেয় করা উদ্দেশ্য হতো। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এরূপ কখনো করেননি এবং একটি মিথ্যা হাদীসও মানুষের সামনে বর্ণনা করেননি। এটা কি পূর্ণ ঈমান, তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রমাণ নয় ? আর এতে কি এটাই স্পষ্ট হয় না যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিশ্বাস ছিলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা হাদীস সম্বন্ধযুক্তকারী তার বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় কখনো কামিয়াব ও কৃতকার্য হতে পারে না।

উষ্ট্র যুদ্ধের কথা কার না মনে আছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের ত্রিশ বছর পর সংঘটিত হয়েছিলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বাহিনীর সাথে গমন করছিলেন। পথিমধ্যে একটি জলাশয়ের কাছে বাহিনীকে দেখে কুকুরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ জলাশয়। পথপ্রদর্শক জবাব দিলো, "এটি হাওয়াবের জলাশয়।" একথা শুনা মাত্রই তাঁর ওপর কিছুক্ষণের জন্য মূর্ছার অবস্থা এসে গেলো। তিনি উচ্চস্বরে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন। তৎক্ষণাৎ স্বীয় উটকে বসিয়ে দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে অস্বীকার করলেন। লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, "নাজানি তোমাদের মধ্যে কার প্রতি হাওয়াবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে।"

এ হাদীস শুনিয়ে অস্থির অবস্থায় বললেন ঃ

আমাকে ফিরিয়ে নাও, আমাকে ফিরিয়ে নাও। কেননা, আমিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই স্ত্রী, যার প্রতি হাওয়াবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

একদিন একরাত বাহিনী সেখানেই পড়ে রইলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফিরে যেতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথীদের

www.pathagar.com

ধারণা ছিলো পথপ্রদর্শকের ভুল হয়েছে। এ জলাশয়ের নাম হাওয়াব নয়। তাঁর ভাগিনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা সর্বাবস্থায় মক্কা ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। শেষে তাঁর সাথীরা বাহিনীর কিছু লোককে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁর তাঁবুর দিকে পাঠিয়ে দেন এবং তারা চিৎকার করে করে বলতে লাগলো ঃ

"জনমণ্ডলী! স্বীয় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আলী ইবনে আবী তালিবের বাহিনী সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। তোমাদের ওপর এখনই তারা হামলা করবে।"

একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ধারণা হলো, বাস্তবিকই পথপ্রদর্শক ভুল বলছে না তো ! হয়তো এটা হাওয়াব ছাড়া অন্য কোনো স্থান হবে। তাই তিনি তাঁর বাহিনীকে হযরত আলীর বাহিনীর দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন।

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, হাওয়াব বিষয়ক কথা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর সতিনদের ছাড়া অন্য কেউ শুনেননি। তাঁর বাহিনীর মধ্যে এক ব্যক্তিও এরূপ ছিলো না যে, একথা জ্ঞাত ছিলো। তিনি ইচ্ছা করলে এ বিষয়টি তাঁর মনের মধ্যে গোপন রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর ঈমানী মর্যাদা এটা পসন্দ করেনি যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে লোকদের থেকে গোপন করে রাখবেন। যদিও এ ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর নিজের সম্পর্কেই ছিলো, কিন্তু তিনি তা সবার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। এ অবস্থায় এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারতেন এবং তাঁর আমানতের মধ্যে খেয়ানত করতেন। এ অবস্থার মধ্যে কি তাঁর এ ভয় হতো না যে, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত করে দিবেন এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা গোপন করে রাখতে পারবেন না।

অধিকন্তু এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কার কন্যা ছিলেন। তিনি সেই মহামানবের কন্যা ছিলেন, যার পরিবারের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াত যুগেও কেউ এ ধরনের অপবাদ আরোপ করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং ইসলামী আমলে স্বয়ং তাঁর ঔরসজাত কন্যা থেকে কিভাবে এরূপ নিন্দনীয় কাজ প্রকাশ পেতে পারে ?

এহেন শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও কোনো হতভাগা যদি এ অভিযোগকে সত্য বলে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তবে তার ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করা উচিত

www.pathagar.com

যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সাফওয়ানের এ কাল্পনিক সম্পর্ক কখন সৃষ্টি হয়েছে ? যে রাতে এ ঘটনা ঘটেছে, সেই রাতে ? এ অবস্থায় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সাফওয়ানের এরূপ দুঃসাহস কিভাবে হতে পারতো ? অথচ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রভাব-প্রতিপত্তি এরূপ ছিলো যে, তিনি ভেতরে আছেন কি নেই, সে কথা হাওদাওয়ালাদের আওয়াজ দিয়ে অবগত হওয়ারও দুঃসাহস ছিলো না। তাছাড়া, সাফওয়ানের মনে এ ধারণা কিভাবে উদয় হতে পারতো যে, উম্মুল মু'মিনীন তাঁর প্রিয় স্বামীর আমানতে খেয়ানত করবেন ? তবু সাফওয়ান যদি তার কাম-প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে এরূপ দুঃসাহস করেও ফেলতো, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ও আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা সম্পর্কে এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) এমন এক ব্যক্তির কাম প্রবৃত্তির শিকার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, যার সাথে তাঁর কোনো পূর্ব সম্পর্ক ছিলো না—সে আকস্মিকভাবেই তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো ?

আর এ কাল্পনিক সম্পর্ক যদি অনেক দিন থেকে হয়ে থাকে, তবে তা এতো সতিন, মুনাফিক ও হিংসুকদের দৃষ্টি থেকে এতোকাল কিভাবে গোপন ছিলো ? আর এ অবস্থায় এ দু'জনের জন্য কি এ একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো যে, তারা যুদ্ধ যাত্রার সময় একে অন্যের সাথে অভিসার করবে এবং ঠিক দুপুরের সময় সর্বসমক্ষে বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করবে ?

এসব যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করার পর আমি পুনরায় সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, এ অভিযোগটি এতোই বাজে, অবিশ্বাস্য ও অযৌক্তিক যে, মুনাফিক, এ যুগের গোঁড়া পাদরী ও এরূপ অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ ছাড়া যাদের ইসলাম ও ইসলাম প্রবর্তকের প্রতি জাতশত্রুতা রয়েছে—অন্য কোনো জ্ঞানী মানুষ এক মুহূর্তের জন্যও এটা বিশ্বাস করতে পারেন না। পাদরী, খৃস্টান ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক হযরত আয়েশার সমালোচনা করা তো আরো বিস্ময়কর। কেননা, তাঁরাও মরিয়াম আলাইহিস সালামের ও ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। আর প্রত্যেকেই অবগত আছে যে, হযরত মরিয়মের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অপবাদ রটানো হয়েছিলো—যেরূপ রটেছে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে।

অপবাদ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিশদ আলোচনা করার কারণ হচ্ছে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনের এ ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনা তাঁর মনে এমন এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা সারা জীবনেও দূর হয়নি। পরবর্তীকালে যেসব ঘটনা ও দুর্যোগ ঘটেছে, তার মধ্যেও

৭—

www.pathagar.com

এ ঘটনার প্রভাব অনেকটা ক্রিয়াশীল দেখা যায়। যদি এরূপ না হতো, তবে কোনো ঐতিহাসিক এ বিষয়টির প্রতি কোনো গুরুত্বই দিতেন না। কারণ, এ অভিযোগ এর যোগ্যই নয় যে, কোনো চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান লোক এক মুহূর্তের জন্যও তা বিশ্বাস করতে পারেন।

www.pathagar.com

বৈধব্য কাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ৪৬ বছর জীবিত ছিলেন এবং ৭০ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই হুজরায়, তাঁর পালার দিনে এবং যেখানে ইনতিকাল করেছিলেন ঠিক সেই স্থানেই সমাহিত হন। পীড়ার তীব্রবার দরুন অধিকাংশ সাহাবী মনে করেছিলেন যে, এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ পীড়া। কিন্তু ওফাতের কিছুকাল আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলো। তাই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি নিয়ে সুনায় অবস্থিত তাঁর বাড়ীতে চলে যান। অন্যান্য সাহাবীগণও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ নিজ কাজে নিমগ্ন হন। কিছুক্ষণ আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো তাড়াতাড়ি ইনতিকাল করবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলের ওপর নিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ তাঁর দেহ ভারী মনে হতে লাগলো। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ ফুটে রয়েছে। মৃত্যুর সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনা গেলো— بل الرفيق الاعلى من الجنة এখন তো বড় সাথীরই প্রয়োজন। একথা শুনে আমি ভাবলাম, তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতিকাল করেছেন, তখন আমি তাঁর মাথা আস্তে বালিশের ওপর রেখে দিলাম। সে সময় আমার মুখ থেকে অনিচ্ছায় কিছু বিলাপধ্বনিও বের হয়ে গেলো।

দু'দিন পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন-দাফনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। কেননা, তাঁর জন্য কবর খনন করা হবে, না লহদ বানানো হবে, সে সিদ্ধান্ত তখনো গ্রহণ করা যায়নি। মক্কাবাসীদের মধ্যে কবর খননের রীতি ছিলো এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে লহদ বানানো। উভয় পক্ষই চাচ্ছিলো তাদের নিজ নিজ রীতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমাহিত করতে। শেষে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনে আবদিল

www.pathagar.com

মুত্তালিব দু'জন লোককে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও আবু তালহার কাছে প্রেরণ করেন।

আবু উবায়দা মক্কাবাসীদের রীতিতে কবর খনন করতেন। আর আবু তালহা মদীনাবাসীদের রীতিতে লহদ বানাতেন। আবু তালহাকে আনার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে দ্রুত তাকে সংগে নিয়ে এলো। কিন্তু আবু উবায়দাকে আনার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে সময় মতো এসে পৌঁছতে পারলো না। সুতরাং আবু তালহা মদীনাবাসীদের রীতিতে লহদ বানালেন এবং রাত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ চিরদিনের জন্য মাটির মধ্যে রেখে দেয়া হলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাত্রিকালে যখন আমরা কোদাল চালানোর শব্দ শুনতে পেলাম, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নশ্বর জগত ছেড়ে উর্ধজগতে পাড়ি জমালেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সেই হুজরা ত্যাগ করা পসন্দ করলেন না। যেখানে তিনি তাঁর জীবনের উৎকৃষ্ট দিনগুলো কাটিয়েছিলেন এবং যেখানে তাঁর প্রিয়তম স্বামী চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন। তিনি সারা জীবন তাঁর কবরের পাশে থাকাই পসন্দ করলেন। তাঁর প্রিয়তম স্বামীর পর তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুও ঐ হুজরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে সমাহিত হন। এ সময় পর্যন্ত তিনি হিজাব ছাড়াই সেখানে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু তেরো বছর পর যখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও ঐ কক্ষে তাঁর দুই সাথীর পাশে সমাধিস্থ হন, তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেখানে পর্দাহীন যাতায়াত ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় নেকাব পরে যেতেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে প্রায় দশ বছর অতিবাহিত করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল তাঁর স্মরণে বৈধব্য অবস্থায় কাটান। এ দীর্ঘ সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর অন্তরে দ্বিতীয় বিবাহ করার চিন্তা আসেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার প্রতি তাঁর সর্বক্ষণ লক্ষ্য ছিলো এবং তাঁর সাথে তিনি যে প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার করেছিলেন, তা ভঙ্গ করার চিন্তা কস্মিনকালও তাঁর অন্তরে স্থান দেননি। তাছাড়া, আল্লাহ তাআলাও সূরা আহযাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন।

www.pathagar.com

বৈধব্যের সুদীর্ঘ সময়টি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবসর ও আরামে কাটাননি। অনর্থক সময় নষ্ট করা তাঁর ধাতেই ছিলো না। দশ বছর পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যে ইলম শিক্ষা করেছিলেন, এখন সেটি কাজে লাগানোর সময় এসে গেলো। তাই ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা দূর হওয়ার পর যখন মুসলমানরা কিছুটা স্বস্তি লাভ করলো, তখন তারা দীনী ইলম শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি দীনী বিষয়াদি শিক্ষালাভ করেছিলেন। সে যুগে তাঁর চেয়ে বড় মুজতাহিদ ও ফকীহ আর কেউ ছিলো না। এজন্য তিনি ছিলেন গণ মানুষের আশ্রয়স্থল। দীনী মাসায়েল জিজ্ঞাসাকারী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শ্রবণকারীদের প্রতিনিয়ত ভীড় লেগে থাকতো। এভাবে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অহর্নিশ মানুষকে ইলমে দীন শিক্ষাদান ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনানোর কাজে মগ্ন থাকেন। এ মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পর যে সময়টুকু বাঁচতে,া তা তিনি তাসবীহ-তাহমীদ ও ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঠিক সেভাবেই কাটিয়ে দেন, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কাটাতেন। এ দু'জন খলীফার সময় তাঁর মর্যাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। কোনো রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করার তাঁর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় পরিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করলো। পরিস্থিতির এ পরিবর্তন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কর্তব্য কর্মেও পরিবর্তন এনে দিলো।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় রাজনীতির ভিত্তি ছিলো আপাদমস্তক দীনী বিধি-বিধানের ওপর। তিনি ও তাঁর স্ত্রীগণ দীনের বিধান থেকে কেশাগ্রও অতিক্রম করতো না। তাছাড়া, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতা। তাই রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার তাঁর কোনো প্রয়োজন হতো না।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যদিও রাজনৈতিক ধুমধাড়াক্কা ব্যাপকতা লাভ করেছিলো, তবু অবস্থা যে আকারই ধারণ করুক না কেনো, তা বিপথগামী হওয়ার কোনো আশংকা ছিলো না। কেননা, জনমনে হযরত উমর

www.pathagar.com

রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রভাব ছিলো প্রগাঢ় এবং তাঁর সামনে তারা টু শব্দটিও করতে পারতো না। এছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হলো, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যকার সম্পর্ক ছিলো খুবই ভালো। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধুত্ব তাদের সন্তানদের ওপরও গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা পরস্পর সতিন হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে বোনের মতো ভালোবাসতেন। অপবাদের ঘটনার সময় হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ ব্যাপারে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতামত জানতে চান, তখন তিনি বলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ধোঁকা দিবেন এবং এমন এক নারীর সাথে আপনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন, যে তাঁর কাছে অপসন্দনীয় ?"

এরপর যখন তাঁর খেলাফতের যুগ এলো, তখনো তিনি হযরত আয়েশার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেননি। ভাতা বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাঁর প্রয়োজনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সদ্ব্যবহার এতো অধিক পরিমাণে ছিলো যে, একবার তিনি দোয়া করেন যে,

"হে খোদা ! উমরের অনুকম্পা আমার ওপর এত অধিক হয়ে গেছে যে, তার প্রতিদান আমি কখনোই পরিশোধ করতে পারবো না। তাই আগামীতে আমাকে ঐসব অনুকম্পার বোঝা বহনের জন্য জীবিত রেখো না।"

যা হোক, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি, যাতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতো। আর না তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, যার দরুন তাঁর রাজনীতিতে যোগদান করা অপরিহার্য হতো।

অবশ্য হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছিলো এবং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে তখন

www.pathagar.com

রাজনীতিতে অংশ নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। পরিস্থিতি যদি পরিবর্তন না হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কখনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন না। সারা জীবন রাসূলের সুন্নাহ ও দীনের আহকাম শিক্ষাদানে কাটিয়ে দিতেন।

---

www.pathagar.com

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

আমরা ইতোপূর্বে বলেছিলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোনো মুহূর্ত অনর্থক নষ্ট হয়নি। বরং তিনি প্রতিনিয়ত মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা-দীক্ষায় মগ্ন ছিলেন। প্রথমত, তাঁর স্বভাবই ছিলো এরূপ যে, তিনি নির্লিপ্ত বসে থাকতে পারতেন না। আর এ জিনিসটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মুহতারাম পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বও দাবী করছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর মুসলিম উম্মাহর তালীম-তারবিয়াতের কাজটি আপন হাতে তুলে নেয়া। আর রাসূলের সাহচর্য থেকে তিনি দীনের যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা দ্বারা অন্য লোকদেরকেও অবহিত করা। ইতিহাস সাক্ষী, তিনি এ মহান দীনী দায়িত্ব অতি উত্তমভাবেই আঞ্জাম দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহ তাআলা যে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন, তার দাবী এও ছিলো যে, তিনি মুসলিম উম্মাহর কাছে তাঁর উপযুক্ত সম্মান লাভ করবেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ও উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন। এদিক থেকে তাঁর মর্যাদা ছিলো আরবের শ্রেষ্ঠতম পরিবারের সদস্যদের চেয়েও উচ্চতম। তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা সকল মুসলমানের ওপরই অবশ্যকর্তব্য ছিলো।

সমাজপতিরা যদি এ সত্যটিকে সামনে রাখতেন এবং তাদের অন্তরে যদি হযরত আয়েশার প্রতি উপযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা থাকতো, তাহলে মুসলিম উম্মাহ কেবল এ মহান সত্তা থেকে—যাঁর বক্ষে ছিলো নবুয়াতের ভেদ-রহস্য লুক্কায়িত এবং যিনি ছিলেন নবুয়াতের জ্ঞান-ভাণ্ডার—কল্যাণলাভের সুযোগই পেতেন না। বরং সেই অপ্রিয় ঘটনাটিও সংঘটিত হতো না, যার দরুন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের এক অনতিক্রম্য পারাবার অন্তরায় হয়ে গেলো।

রাজনীতির একটি সোনালী মূলনীতি হলো, জাতিকে তার প্রকৃত হিতাকাংখী, একনিষ্ঠ সেবক ও নিঃস্বার্থ পথপ্রদর্শকদের যথার্থ ভক্তিশ্রদ্ধা করা উচিত এবং কোনো প্রজা ও রাষ্ট্রীয় সদস্যের পক্ষ থেকে এমন কোনো আচরণ প্রকাশ পাওয়া অনুচিত, যার দ্বারা এ সম্মানীয় ব্যক্তিদের অবমাননা ও হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। কেননা, একনিষ্ঠ কর্মীদের অবমাননা, শুধু তাদেরই অবমাননা নয়, প্রকৃতপক্ষে গোটা জাতিরই অবমাননা।

www.pathagar.com

রাজনীতির এ মূলনীতি এখানেও প্রযোজ্য। বুদ্ধিমত্তা ও সাবধানতার দাবী হচ্ছে কোনো তরফ থেকেই হযরত আয়েশার ইযযত-সম্মানে তফাৎ সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিলো না। তিনি যথারীতি জ্ঞানের ভাণ্ডার মানুষের সামনে বিতরণ করতে থাকতেন এবং ইসলামী আইন-কানুন বিন্যাস সাধনে দেশ–নেতাগণ তৎপর হতেন। কিন্তু আফসোস ! এরূপ হতে পারেনি। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদার মধ্যে কোনো তফাৎ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি পালটে যায় এবং তাঁর জীবন এক নতুন যুগে প্রবেশ করে।

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মচারীর অব্যবস্থা ও অনভিজ্ঞতার দরুন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বহু কষ্ট ও বিপদের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করেন, তা হচ্ছে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে ভাতা পেতেন, তা তিনি হ্রাস করেন। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি যুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশার ভাতার দরুন রাষ্ট্রের কোন্ কাজটি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। যদি বায়তুল মালে ধন-দৌলত কম থাকতো কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ভাতা ও অনুদান ইত্যাদি হ্রাস করা দরকার হতো, তাহলে এরূপ করার মধ্যে কোনো দোষ হতো না। আর এমতাবস্থায় হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহারও কোনো আপত্তি থাকতো না। কিন্তু ব্যাপারটি ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বায়তুল মাল ছিলো দিরহাম-দীনারে পরিপূর্ণ এবং চতুর্দিক থেকে ধন-দৌলতের স্তূপ চলে আসছিলো। বার্ষিক আড়াই লাখ দীনার একমাত্র আফ্রিকা থেকেই খাযনা আদায় হতো। অন্যান্য এলাকার খাযনার পরিমাণ এর থেকেই অনুমান করা যায়।

ধন-ভাণ্ডার যদি ধন-সম্পদে ভরপুর থাকে এবং রাষ্ট্রীয় আয় যদি অপরিমেয় হয়, তখন কারণ না দর্শিয়ে যদি কারো ভাতা হ্রাস করা হয়, তবে তার মনোকষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও তেমনি মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। এতে এটা মনে করা উচিত নয় যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ধনলিপ্সু ছিলেন। তিনি কখনো ধন সঞ্চয় করেননি এবং ধনকে তিনি ভালোও দেখেননি। অনেক সময় এমনো হতো যে, তিনি মাসিক ভাতা পেয়ে সংগে সংগে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে ফেলতেন এবং নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখতেন না।

ধন-সম্পদের প্রতি তিনি এতোই নিরাসক্ত ছিলেন যে, তিনি নিজেই কেবল ধন সঞ্চয় থেকে বিরত থাকতেন না, বরং সাহাবা কিরামকেও তিনি ধন সঞ্চয়

www.pathagar.com

করতে নিষেধ করতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন যে, ব্যবসা বা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা যতই ধনাঢ্য হোক না কেনো, ধন-সম্পদ যেনো তারা কখনো জমা করে না রাখেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উচ্চমর্যাদাশীল সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি বিরাট তেজারতী কাফেলা মদীনায় এলো। ঐ কাফেলায় সাতশত উট ছিলো। উটগুলোর ওপর গম, আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বহন করে আনা হয়েছিলো। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐগুলো বিক্রি করে মুনাফা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আবদুর রহমান সংগে সংগে ঐ সম্পদগুলো আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বিলিয়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

যা হোক, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার অসন্তোষের কারণ এই ছিলো না যে, তাঁর ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ ছিলো। বরং তাঁর দুঃখ প্রকাশের কারণ ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ও উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার দিক থেকে যতটুকু সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিলো, অকারণে তা হ্রাস পাওয়া।

এদিকে দেশের সর্বত্র হযরত উসমানের নিয়োগকৃত গভর্নরদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছিলো। কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো দীনের সাথে তাদের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। আর কারো কারো সম্পর্কে বলা হতো যে, নিছক আরাম-আয়েশই হচ্ছে তাদের সমগ্র সাধ্য-সাধনার লক্ষ্যস্থল। মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের প্রতি তাদের আদৌ দৃষ্টি নেই। মানুষ নিজ নিজ এলাকার গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মদীনায় আসতো এবং খলীফা ছাড়া সাহাবা কেরামের সামনেও তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রকাশ করতো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেহেতু মদীনার সবচেয়ে সম্মানিতা ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাই তারা তাঁর কাছেও চলে আসতো এবং নিজ নিজ গর্ভনরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো।

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, একবার লোকেরা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সৎ ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে খলীফার দরবারে উপস্থিত হলো। তারা অভিযোগ করেছিলো যে, ওয়ালীদ একবার মদমত্ত অবস্থায় লোকদের ফজরের নামায পড়িয়েছেন এবং নামাযের পর তাদের বললেন—তোমরা চাইলে আমি অধিক রাকআতও পড়িয়ে দিতে পারি। কেননা, আজ আমার অবস্থা খুবই আনন্দদায়ক। কিন্তু হযরত উসমান

www.pathagar.com

রাযিয়াল্লাহু আনহুর মোসাহেব ও পরামর্শদাতাগণ ওয়ালীদ সম্পর্কে এ অভিযোগ সঠিক বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। বললো, "তোমাদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তোমাদের কেউ যখন তার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে উঠে, তখন সহসা তার বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ রটনা করা শুরু করে দেয়।" একথা বলে তারা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলো।

তারা সেখান থেকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলো এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর কাছে খুলে বললো। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁর ঘরের এক অংশে তাদের অবস্থান করার জন্য স্থানও দিলেন। সকাল বেলা যখন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে আসলেন, তখন তিনি হযরত আয়েশার ঘরে তাদেরকে অনেক গরম গরম কথাবার্তা বলতে শুনলেন। তিনি খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন ঃ ইরাকের বেদীন ও ফাসেক-ফাজের লোকদের আয়েশার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় মেলে না।১ হযরত আয়েশাও তার যথাযথ জবাব দেন এবং বলেন ঃ উসমান ! তুমি রাসূলুল্লাহর সুন্নাত ত্যাগ করেছো। লোকেরা যখন এ শোরগোল শুনতে পেলো, তখন তারা মসজিদের দিকে ধাবিত হলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত মসজিদ ভরে গেলো। কেউ কেউ বললো, হযরত আয়েশা যা করেছেন ঠিকই করেছেন। কিন্তু কারো কারো অভিমত ছিলো—এসব ব্যাপারে নারীদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এ তর্কবিতর্ক এতোই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো যে, পরস্পরে তিক্ত কথাবার্তা পর্যন্ত বলাবলি হয়ে গেলো। শেষে কয়েকজন সাহাবী হযরত উসমানের কাছে গেলেন এবং তাঁর ভ্রাতা ওয়ালীদকে বরখাস্ত করার জন্য জোর তাকীদ দিলেন। অন্যথায় ফেতনা বৃদ্ধি পাবে বলেও তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন।

ইরাকীদের মতো মিসরীয়রাও তাদের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মদীনা আগমন করেন এবং তারা খলীফার কাছে আরয করেন যে, আবদুল্লাহ এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়েছেন, যে আপনার নিকট তার (আবদুল্লাহর) বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছিলো। হযরত উসমানের কাছ থেকে এ প্রতিনিধি দলটি হযরত আয়েশার কাছে গেলো

১. একথাটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যাঁর সহৃদয়তা ও ক্ষমাসুলভ নীতি থেকে অবৈধ ফায়দা উঠিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা এক বিরাট বিদ্রোহ দাঁড় করিয়েছে এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তো এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি জীবন দেয়া স্বীকার করলেন কিন্তু নিজের সাহায্যার্থে কোনো ব্যক্তিকে অস্ত্রধারণ করতে পর্যন্ত অনুমতি দেননি। এ ঘটনা ইতিহাসের একটি পরম সত্য। তাই একথা কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ঐ সময় তিনি ক্রোধে এতোই অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েছিলেন যে, হযরত আয়েশার শানে এরূপ অশোভন বাক্য উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি। যাতে হযরত আয়েশা কেবল হেয় প্রতিপন্নই হননি, বরং স্বয়ং তাঁর মস্ত দুর্নামও ছিলো।—(অনুবাদক)

www.pathagar.com

এবং তাঁর কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে পদচ্যুত করার জন্য আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু আপনি তা করতে অস্বীকার করেন। এখন সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এর সুবিচার করা আপনার কর্তব্য।

মিসর থেকে আগত এই লোকেরা নামাযের সময় নামাযীদের সামনে তাদের অভিযোগ পেশ করতো, উম্মুল মু'মিনীনের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের দুঃখের কাহিনী বলতো এবং প্রবীণ সাহাবীদের কাছে গিয়ে তাদের গভর্নরের প্রকৃত ও পরিকল্পিত যুলুম-অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনাতো। এভাবে মদীনায় এক উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সাহাবাগণ আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে পদচ্যুত করে তদস্থলে অন্য কাউকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করার জন্য হযরত উসমানের কাছে পীড়াপীড়ি করলেন। শেষে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মিসরীয়দের দাবী অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর স্থলে হযরত আয়েশার ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করলেন এবং তাকে একটি নিয়োগপত্রও প্রদান করলেন। কিন্তু এ নিয়োগই সেই বিরাট ঘটনার কারণ হলো যার ফলে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

ঘটনা এভাবে ঘটেছে ঃ

মিসরীয়রা যখন মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলো, তখন তাদের সাথে পথিমধ্যে এক গোলামের সাক্ষাত হলো। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। তারা তাকে আটক করে তার জামা তল্লাশী করলো। তল্লাশীর পর তার কাছে একটি পত্র পাওয়া গেলো। পত্রের ওপর খলীফার সীলমোহর মারা ছিলো। পত্রটি লেখা ছিলো মিসরের গর্ভনর আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর নামে। তাতে লেখা ছিলো ঃ

"মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ও তার সাথীরা যখন তোমার কাছে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে হত্যা করবে। আর যে নিয়োগপত্র তার কাছে রয়েছে, তাকে রহিত মনে করবে। আর যে পর্যন্ত খলীফার দরবার থেকে তোমার কাছে স্পষ্ট নির্দেশ না পৌঁছবে, রীতিমতো স্বীয় পদে বহাল থেকে আপন কাজ চালিয়ে যাবে।"

এ চিঠির রহস্য আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। প্রবল ধারণা এই যে, এ চিঠি মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর

www.pathagar.com

অগোচরে নিজের পক্ষ থেকে লিখে গোলামের হাতে আবদুল্লাহর কাছে প্রেরণ করেন।১

যা হোক, এ চিঠির ফলে সমস্ত প্রবীণ সাহাবা ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিরতিশয় দুঃখ পান এবং এরপর পরিস্থিতি এ. । ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো, যা নিরসন করা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে গেলো।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায় যে, হযরত উসমানের যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবনতি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো যে, তিনি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালের মতো নিজেকে সমকালীন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলেন না এবং তাঁকে বাধ্য হয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর গভর্নরগণ ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে হয়। এ অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অংশ ছিলো হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেইসব নাদান পরামর্শদাতা ও উপদেশদানকারীদের, যারা জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উম্মতের মধ্যে তাঁর অর্জিত মর্যাদা থেকে নিচে নামানোর চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, বরং বাইর থেকে যেসব লোক অভিযোগ নিয়ে মদীনায় আসতো, তাদেরকেও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গমন করে তাদের অভিযোগ পেশ করতে বাধা দেন। এ ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে ন্যক্কারজনক এ কাজটি করলো যে, কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে তাঁর ভ্রাতার জীবন নাশের প্রচেষ্টা চালায় এবং মিসরের গভর্নরের নামে তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ জারী করে।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দুরভিসন্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কেননা, তিনি নেক ও পরহেযগারীর এমন উচ্চমার্গে অবস্থান করছিলেন যে, তাঁর থেকে এরূপ কার্যকলাপ প্রকাশ পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি তাঁর জান বাঁচানো ও তাঁর চারপাশে বিরাজিত বিরাট বিপত্তি থেকে বাঁচার জন্য একবিন্দু রক্ত ঝরার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা কিভাবে করা যায় যে, তিনি তাঁর বন্ধু ও প্রিয় সাথীর পুত্রকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেন? অথচ তাঁর দোষ এতটুকুই ছিলো যে, মিসরবাসীরা আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর স্থলে তাঁর নাম মিসরের গভর্নর হিসাবে পেশ করেছিলেন।

১. একথা ঠিক নয়। এ চিঠি ছিলো ফেতনাবাজদের এক মস্তবড় মোড়ল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার একটি মনগড়া আবিষ্কার। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে–সে ইতোপূর্বেও জাল চিঠি বানিয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলো।–(অনুবাদক)

www.pathagar.com

জানি না, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মোসাহেবরা মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকে হত্যা করানোর মধ্যে কি কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন এবং এরূপ নির্বুদ্ধিতাসুলভ নির্দেশ তারা কোন্ উপকারিতার প্রেক্ষিতে দিয়েছিলেন। যা হোক, এরূপ আচরণের দরুন যদি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ ও হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক বর্ণনায় প্রকাশ, একবার হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বক্তৃতা করছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন তাঁর আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোর্তা হাতে নিয়ে বললেন ঃ

জনমণ্ডলী ! এই হচ্ছে রাসূলের কোর্তা। এটি এখন পর্যন্ত পুরানো হয়নি। কিন্তু উসমান রাসূলের সুন্নাতকে পুরানো ও ধ্বংস করে দিয়েছে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মোসাহেবদের আচরণ এমনিভাবেই চালু ছিলো। শেষে পরিস্থিতি যখন সীমা অতিক্রম করলো, তখন তাঁর হুশ হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এতো দিন তিনি কি ভয়াবহ ভ্রমের অনুষ্ঠান করে চলছিলেন। কিন্তু এখন আফসোস করে লাভ নেই।

বিদ্রোহীরা যখন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৃহ অবরোধ করলো এবং তাঁর গৃহে পানি নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলো, তখন এক নবী সহধর্মিণী ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সতিন হযরত উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা একটি খচ্চরের ওপর পানির একটি মশক নিয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৃহের দিকে রওয়ানা হন। বিদ্রোহীরা তাঁকে আটক করে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কোথায় চলছেন ? তিনি জবাব দিলেন, 'উসমানের কাছে বনু উমাইয়ার ইয়াতীম ও বিধবাদের কিছু আমানত রক্ষিত আছে। আমি সেগুলো নষ্ট হওয়ার আশংকা করছি। আমি সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে যাচ্ছি।" বিদ্রোহীরা বললো, তুমি মিথ্যা কথা বলছো (নাউযুবিল্লাহ)। একথা বলে তারা তলোয়ার দ্বারা খচ্চরের রশি কেটে দিলো। তিনি খচ্চর থেকে পড়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের পা দ্বারা দলিত-মথিত হওয়ার উপক্রম হলেন। ইত্যবসরে কোনো কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন এবং তাঁকে তাঁর গৃহে পৌঁছে দিলেন।

এ ভয়াবহ বিপর্যয়কালে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মদীনায় অবস্থান করা ভালো মনে করলেন না। তিনি হজ্জের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং

www.pathagar.com

তাঁর সাথে তাঁর ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকেও নিয়ে যেতে চাইলেন।[১] কিন্তু তিনি মক্কা যেতে অস্বীকার করলেন। তাই বাধ্য হয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একাকিনীই মদীনা থেকে মক্কা গমন করেন।

এ সময় ফেতনার মূল হোতা—মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলো এবং বললো ঃ উম্মুল মু'মিনীন ! আপনি যদি এ সময় মদীনা ত্যাগ না করতেন, তাহলে ভালো হতো। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে এবং উসমানের জীবন বিপন্ন। আপনি এখন এখানে অবস্থান করলে হয়তো সমস্যা নিরসনে কিছুটা সহায়তা হতো। কিন্তু হযরত আয়েশা মদীনায় অবস্থান করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বললেন ঃ

"তোমরা কি চাও যে, উম্মু হাবীবার সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছে, আমার সাথেও সেরূপ আচরণ করা হোক ? তখন তো আমাকে কেউ রক্ষা করারও থাকবে না।"

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, এ সংকটপূর্ণ সময়ে মারওয়ানের মনে উদারতা ও বদান্যতাও উদয় হয়। সে হযরত আয়েশার কাছে গমন করে এবং তাকে মদীনায় অবস্থান করে শিক্ষাদান কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য অনুরোধ করে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার জবাবে বলেন ঃ "আমি হজ্জে গমন করছি এবং সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি।" মারওয়ান বললো, "আপনি এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। হজ্জের প্রস্তুতিতে আপনি যে পরিমাণ অর্থ খরচ করেছেন আমি তার দ্বিগুণ দিয়ে দেবো।"

এ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন আত্মসংম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ

"তোমরা ধারণা করছো, আমি তোমাদের সাহেব (হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে সন্দেহে নিমজ্জিত আছি। আল্লাহর কসম ! আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমার ইচ্ছে হয়, তাকে তুলে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতাম।"

---

১. হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক তাঁর ভ্রাতাকে মক্কা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা দ্বারা বুঝা যায় তিনি ফেতনার তীব্রতা হ্রাস করার জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ছিলেন ফেতনাবাজদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাই মদীনা থেকে তাঁর প্রস্থান করার অর্থ ছিলো বিদ্রোহীরা তাদের একজন প্রধান সহযোগীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকা।–(অনুবাদক)

www.pathagar.com

শুধু এতটুকুই নয়, এ ধরনের আরো বহু রিওয়ায়াত হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। এক রিওয়ায়াতে তো এ পর্যন্ত বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ

"উসমানকে হত্যা করো। কেননা, সে কুফরের শিকার হয়েছে। এছাড়া যে ব্যক্তিই হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সাক্ষাত করতে যেতো, তাকে তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাঁর সহযোগীদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য উৎসাহিত করতেন।

কিন্তু এ সমুদয় রিওয়ায়াতই অনির্ভরযোগ্য। বড় জোর এটা হতে পারে যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মচারীদের সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ ছিলো।

এ হাঙ্গামা সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জড়িয়ে যেসব রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, তার বেশীর ভাগই সন্দেহমুক্ত নয়। তার কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকে মিসরের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। মিসর পৌছার পর মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সাথে তাঁর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। বানু উমাইয়া প্রথমে তাঁকে পা ধরে শহরে হেঁচড়ায়। তারপর তাঁকে খুব পিপাসার্ত রেখে হত্যা করে। এরপর তাঁর লাশকে গাধার চামড়ার মধ্যে সিলাই করে আগুনের ওপর রেখে ভুনা করে। অতঃপর তাঁর রক্তাক্ত কোর্তা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী নায়েলার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এ ঘটনার পর যখন ঈদ এলো, তখন মুআবিয়া ইবনে খুদায়জের ভগ্নী একটি ভেড়ার বাচ্চা যবেহ করে তার গোশত ভুনা করে এবং জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে সেই ভুনা গোশত হযরত আয়েশার কাছে প্রেরণ করেন। সাথে সাথে একথা বলে পাঠান যে, আপনার ভাইকে এভাবে ভুনা করা হয়েছে। তখন থেকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আর কোনো ভুনা গোশত ভক্ষণ করেননি। শপথ করেন যে, যতদিন বেঁচে থাকবেন ভুনা গোশত স্পর্শ করবেন না।

মুসলমানরা যখন মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরের সাথে বানু উমাইয়ার এ বেদনাদায়ক ও হিংস্র আচরণের কথা অবগত হন, তখন তাদের অন্তর প্রতিশোধ স্পৃহায় ভরে গেলো। তাদের ধৈর্যের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়েছিলো। তারা নতুন শাসকদের হাতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অধিক হেনস্তা বরদাশত করতে পারছিলেন না। এদিকে বানু উমাইয়াও বুঝতে পারলো। তারা অনুভব করলো যে, তাদের কোনো কোনো নির্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের দুষ্কর্মের

www.pathagar.com

দরুন সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। যা হোক, বানু উমাইয়ার ইযযতের প্রশ্ন ছিলো। তাঁরা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহকারীদের দুর্ব্যবহারকে সঙ্গত প্রতিপন্ন করার জন্য প্রচার করতে শুরু করলো যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টির মূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিলো হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার। এ উদ্দেশ্যে তারা উদ্ভট উদ্ভট রিওয়ায়াত বানিয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। যার ফলে বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের জন্য সত্য ও মিথ্যা বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করা সুকঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমরা জানি না, কোন্ বর্ণনাটি অতিরঞ্জনমুক্ত ও কোন্‌টি নয়।১

শুধু বানু উমাইয়া হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি অসত্য ও মনগড়া রিওয়ায়াত সম্পর্কযুক্ত করেনি, বরং এ কাজে শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের সাথে রয়েছে। বানু উমাইয়ার মতো তারাও জাল রিওয়ায়াত তৈরী করে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চরম শত্রুতা ছিলো। তিনি যে কোনো মূল্যে তাঁর রাজত্ব খতম করতে চাচ্ছিলেন। হাঙ্গামা ছড়ানোর ক্ষেত্রে মিসরীয় ও ইরাকীদের চেয়ে তাঁর হাত কম সক্রিয় ছিলো না।

অবশ্য উপরোক্ত রিওয়ায়াতগুলো হযরত আয়েশার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে দুই পক্ষের উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। বানু উমাইয়া তো হযরত আয়েশাকে হযরত উসমানের দুশমন প্রমাণ করে তাদের সেই অপকর্মকে পৃথিবীবাসীর কাছে হালকা করতে চাচ্ছিলো, যা তারা হযরত আয়েশার ভ্রাতাকে মুছলা (নাক-কান কর্তন) করে আঞ্জাম দিয়েছিলো এবং যার দরুন চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছিলো। পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায় হযরত আয়েশার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার যে দাবী তুলেছিলেন, তা ছিলো (নাউযুবিল্লাহ) ধোঁকা ও প্রতারণা মাত্র। তারা বলেন যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিলেন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি গণ্ডগোলকারীদের উস্কানি দিয়ে এ হাঙ্গামা দাঁড় করেছিলেন।

১. গ্রন্থকারের এ বিশ্লেষণ থেকে সেইসব রিওয়ায়াতের মূলতত্ত্ব জানা যেতে পারে, যা ইতোপূর্বে হযরত আয়েশা ও হযরত উসমানের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।–(অনুবাদক)

www.pathagar.com

উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ উসমান হন্তাদের জন্যও বিশেষ উপকারী ছিলো। কেননা, ঐসব রিওয়ায়াতের আলোকে তাদের অপরাধ খুব লঘু মনে হচ্ছিলো। তারা নিজেদেরকে শাস্তিযোগ্য ভাবছিলো না।

এসব ঘটনা থেকে ভালোভাবেই বুঝা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কি কি কারণে দেশীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা শুরু করেন। যে পর্যন্ত হযরত উসমানের রাজনৈতিক যুগের সম্পর্ক—একথা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তার মধ্যে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুআনহাকে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়। তা সত্ত্বেও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে এরূপ হয়নি। তখনকার রাজনীতিতে তিনি তাঁর মরযী মতো কদম রাখেন।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শুরু থেকেই তাঁর ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়েছিলো। আর এ মতানৈক্যই সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ ধারণ করে। এ প্রেক্ষিতেই এ মর্মান্তিক ঘটনাও সংঘটিত হলো যে, খেলাফতকামী[১] কিছু লোক হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইমেজ ও মর্যাদা থেকে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে তাঁকেও তাদের সাথে শরীক করে নেয় এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দস্তুর মতো অভিযান শুরু করে দেয়। অথচ তাঁর পক্ষে এরূপ করা মোটেই সঙ্গত ছিলো না। উম্মুল মু'মিনীনের ব্যক্তিত্ব এরূপ ছিলো না যে, তাঁকে এ ধরনের রাজনৈতিক কলহের মধ্যে টেনে এনে তাঁর মান-মর্যাদার হানি ঘটানোর চেষ্টা করা হবে। উম্মুল মু'মিনীন উভয় পক্ষের কাছে সম্মানিতা ছিলেন। আর তাঁর সম্মানের দাবী ছিলো—তাঁকে রাজনীতির ডামাডোল থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হতো। তাই তালহা ও যুবায়র যখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সাথে নিয়ে বসরার দিকে রওয়ানা হন, তখন সাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এ প্রশ্নই করেছিলেন। তিনি ঐ দু'জনকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

হে যুবায়র ! তুমি রাসূলুল্লাহর সহচর। আর হে তালহা তুমি রাসূলুল্লাহর হিফাজত মানসে আপন হাতে তীর পেতে নিয়েছো। তুমি উম্মুল মু'মিনীনকে তো নিজের সাথে নিয়ে নিয়েছ। কিন্তু বলো, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়েছ কি ? তুমি তোমার স্ত্রীদের ইযযতের খেয়াল রেখেছ বটে, কিন্তু উম্মুল মু'মিনীনের ইযযত-সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখোনি।

১. ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, কোনো পর্যায়েই হযরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের জন্য খেলাফত কামনা করেছিলেন। তাঁরা উসমান হন্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার দাবী অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু খেলাফতের দাবী কখনো করেননি।–(অনুবাদক)

www.pathagar.com

বানু সাদের এ নওজওয়ানের আপত্তি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলো। তালহা ও যুবায়রের পক্ষে হযরত আলীর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশাকে আপন মতাবলম্বী বানানোর অধিকার তো অবশ্যই ছিলো, কিন্তু তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়া এবং বিরুদ্ধবাদীদের হাতে তাঁকে বেইযযত করানোর ইখতিয়ার তাদের কোনোভাবেই ছিলো না।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত উসমানের বিরুদ্ধে যখন শোরগোল চলছিলো, তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হজ্জের জন্য মক্কা চলে গিয়েছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে হযরত ইবনে আব্বাসও হযরত উসমানের একটি বার্তা নিয়ে সেখানে পৌছেন। সে বার্তায় হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহীদের বিশৃংখলার কথা উল্লেখ করে হাজীদেরকে তাঁর সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। মক্কা পৌছে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথেও সাক্ষাত করেন। কোনো কোনো রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে বললেন, তোমরা লোকদেরকে উসমানের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ না করে তাঁর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করো। আর এভাবে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর খেলাফতের জন্য পথ সুগম করো। কেননা, তার সততা ও সুবিবেচনা কিংবদন্তীর মতো।[১] তিনি যদি খেলাফত লাভ করতে পারেন, তবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পদাংক অনুসরণ করে চলবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে বললেন, উম্মুল মু'মিনীন ! উসমানকে যদি খেলাফত থেকে সরিয়েও দেয়া হয়, তবু আপনার আশা পূরণ হবে না। কেননা, মানুষ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা বানাতে সম্মত হবে না।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "ঠিক আছে, তুমি চলে যাও। আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাই না।"

---

১. এ বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। কেননা, স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একাধিকবার এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানকে বলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাকে একটি কোর্তা পরাবেন। লোকেরা সেই কোর্তা খুলে নিতে চাইবে। কিন্তু তুমি তা কখনো খুলে নিতে দিবে না।"

এ হাদীস বর্তমান থাকতে—যার রাবী স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদের বিরুদ্ধাচরণ করে লোকদেরকে হযরত উসমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং তাঁকে পদচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালান।—(অনুবাদক)

www.pathagar.com

ইত্যবসরে মদীনার সংকটময় অবস্থার খবর মক্কায় পৌঁছাও শুরু হয়। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সংকট নিরসন মানসে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করেন। পথিমধ্যে তিনি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত লাভের সংবাদ পান। তিনি আরো জানতে পান যে, মদীনা বিদ্রোহীদের পূর্ণ দখল ও কর্তৃত্বাধীন। সেখানে তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কাজ করতে পারে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সহযাত্রীদের তৎক্ষণাৎ মক্কা প্রত্যাগমনের নির্দেশ দেন। পথে যেসব লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হতো, তাদের সামনে তিনি বেদনাদায়ক ভাষায় হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা আলোচনা করতেন এবং এ অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এ অবস্থা দেখে উবায়দ ইবনে আবী সালমা—যিনি মাতুল গোষ্ঠীর দিক থেকে তাঁর আত্মীয় ছিলেন—বললেন ঃ

উম্মুল মু'মিনীন ! একি করছেন ? উসমানের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আপনিই আওয়াজ তুলেছেন। এখন আপনিই সর্বপ্রথম তাঁর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার দাবী তুলছেন ?"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন ঃ

এটা ঠিক যে, আমি ওসমানের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছি। কিন্তু এখন যা বলেছি, তা আগের কথার চেয়ে উত্তম।১

মদীনা তো পূর্ণভাবে বিদ্রোহী ও উসমান হন্তাদের দখলে ছিলো। কিন্তু মক্কা তখন তাদের প্রভাবমুক্ত ছিলো। তাই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধবাদীরা চতুর্দিক থেকে এসে মক্কায় সমবেত হতে লাগলো। তাদের মধ্যে বানু উমাইয়াও ছিলো—যাদের শক্তি-সামর্থ হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর খতম হয়ে গিয়েছিলো। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত গভর্নরও ছিলো—যাদের রাজত্ব হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার দরুন বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের সেইসব কর্মচারীও ছিলো—যারা তাদের অতীত দুষ্কর্মের হিসাব-নিকাশের আশংকা করছিলো। তালহা ও যুবায়র এর সদ্ব্যবহার করে তাদের

১. রাজনীতিতে এ ব্যাপারটিকে সুবিধাবাদ বলা হয়ে থাকে। একজন দুনিয়াদার মানুষ সুবিধাবাদকে নিজের জন্য যতই উপকারী মনে করুক না কেনো, উম্মুল মু'মিনীনের জন্য তা কখনো শোভনীয় ছিলো না। হযরত আয়েশার মতো চতুর ও বুদ্ধিমতী মহিলা সম্পর্কে এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করবেন, যার দরুন তার বিরুদ্ধে সুবিধাবাদের অভিযোগ করা যেতে পারে। সুতরাং যুক্তিগতভাবেও এ ধরনের রিওয়ায়াত বিশ্বাসযোগ্য নয়।—(অনুবাদক)

www.pathagar.com

সামনে হযরত উসমানের প্রতিশোধ নেয়ার দাবী পেশ করেন। আর সবাই সর্বসম্মতভাবেই এ দাবীকে সমর্থন করে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে নেন। সে মতে এ তিনজনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী গঠন করা শুরু হয়—যার উদ্দেশ্য ছিলো উসমান হন্তাদের প্রতিশোধ নেয়া।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঐসব লোকের পথপ্রদর্শকতা তো গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রকৃতিগত-ভাবে তা খারাপ দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি লশকরের নেতৃত্ব নিছক এজন্য গ্রহণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ব্যাকুল মনে হচ্ছিলো। আর এ উদ্দেশ্যে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলো। প্রবল ধারণা হচ্ছে, লোকদের মধ্যে যদি পূর্ণ মতৈক্য না হতো এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার দাবীতে প্রভাবান্বিত হয়ে তারা এক পতাকাতলে সমবেত না হতো, তাহলে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা না তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতেন, আর না লশকর নিয়ে বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। গমনপথেও এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো, যার দরুন তিনি সামনে অগ্রসর হতে ইতস্তত করছিলেন। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে ঘটনাটি ঘটলো, তা তাঁর মনে এতোবড় আঘাত হানলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমনের সংকল্প করলেন। লশকরের লোকেরা বাহানা করে যদি তাঁকে আটকে রাখতে সফল না হতো, তবে নিশ্চিতভাবেই উষ্ট্রযুদ্ধের মতো অনভিপ্রেত ও অনুশোচনামূলক ঘটনাবলী কখনই সংঘটিত হতো না।

উপরোক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার লশকর যাত্রা করে যখন হাওয়াব জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে আরম্ভ করলো। তিনি পথপ্রদর্শকের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ জলাশয় ? সে জবাব দিলোঃ এটি হাওয়াব জলাশয়। একথা শুনা মাত্রই তিনি চমকে উঠলেন। বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ জানি না, তোমাদের মধ্যকার কার বিরুদ্ধে হাওয়াবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে।"

একথা বলে তাঁর উট বসিয়ে দিলেন এবং বলতে লাগলেন আমাকে ফিরে যেতে দাও। আফসোস ! আমিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই স্ত্রী, যার জন্য হাওয়াবের কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা নিয়তি হয়েছিলো।"

www.pathagar.com

একদিন এক রাত হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেখানেই অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে অগ্রসর হওয়ার নামও নিলেন না। শেষে লশকরের লোকেরা পঞ্চাশজন বেদুইনকে উৎকোচ দিয়ে হযরত আয়েশার সামনে এরূপ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত করলো যে, হাওয়াব জলাশয় পিছনে চলে গেছে। এ সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী কেউ কেউ চিৎকার করা শুরু করলো ঃ নিজকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করো। আলী ইবনে আবী তালিবের লশকর তোমাদের অপেক্ষায় আছে এবং তারা তোমাদের ওপর হামলা করতে প্রস্তুত।

শেষে অতিকষ্টে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লশকরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেন।

শুধু তাই নয়। উষ্ট্রযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা এমন একটি প্রমাণও পাই না, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সাথে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিলো। তাঁর ধারণা ছিলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সুন্দরভাবে মিটে যাবে। যুদ্ধের তো তিনি কল্পনাও করেননি। যুদ্ধ করা তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বসরার গভর্নরের দূত আবুল আসওয়াদ দুইলী ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যকার আলোচনার মধ্যে। আবুল আসওয়াদ দুইলী যখন তাঁর কাছে এলেন, তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

আবুল আসওয়াদ ! আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য কেউ যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে, তা কি সম্ভব ?

আবুল আসওয়াদ ছিলেন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘোর সমর্থক। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ

আল্লাহর কসম ! আপনাকে এমন কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

কয়েকদিন এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কেটে গেলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ফৌজসহ বসরার বাইরে মারবাদ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। বসরার শাসক উসমান ইবনে হানীফ কয়েকবার হযরত আয়েশার ওপর হামলা করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখলেন এবং অবস্থার উন্নয়নকল্পে স্বীয় সেনাদল মারবাদ থেকে সরিয়ে দারুর রিয্ক নিয়ে যান। কিন্তু উসমান ইবনে হানীফ তার বাসনা চরিতার্থ করতে চান। তাকে বুঝানো-সুঝানো সত্ত্বেও তিনি একদিন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

www.pathagar.com

আনহার বাহিনীর ওপর হামলা করেন। যারা দারুর রিযকে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সারাদিন লড়াই চললো। উভয় পক্ষের ছয়শত লোক নিহত হলো। অসংখ্য আহত হলো। সন্ধ্যা নেমে এলে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর লোকজনকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং স্বীয় শিবিরে ফিরে আসেন।

ইতোমধ্যে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দূত কা'কা' ইবনে উমরকে তালহা, যুবায়র ও হযরত আয়েশার সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠান। তিনি সর্বপ্রথম হযরত আয়েশার কাছে যান এবং বলেন ঃ

উম্মুল মু'মিনীন ! আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

বেটা ! উম্মতের সংস্কারকল্পে।

কা'কা' বললেন ঃ

তালহা ও যুবায়রকেও একটু ডেকে আনুন। তারাও এসে আমাদের আলোচনা শুনুক। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঐ দু'জনকে ডেকে পাঠালেন। কা'কা' তাদেরকে বললেন ঃ

আমি উম্মুল মু'মিনীনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। তিনি জবাব দিলেন উম্মতের সংস্কারকল্পে। তোমরা দু'জন এ ব্যাপারে কি বলছো। তোমাদের অভিমতও কি তাই, যা উম্মুল মু'মিনীন বলেছেন।

ঐ দু'জন সমস্বরে জবাব দিলেন ঃ

উম্মুল মু'মিনীন ঠিকই বলেছেন। আমরা বাস্তবিকই সংশোধন কল্পে এখানে এসেছি।

কা'কা' বললেন ঃ

"এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য বসরার যুদ্ধে ছয়শত লোক নিহত হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছয় হাজার লোক তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছে। তোমরা মারকুস ইবনে যুহায়রকে হত্যা করতে চেয়েছ। কিন্তু তার সাহায্যে ছয় হাজার লোক তোমাদের বিরুদ্ধে বের হয়ে এসেছে। তোমরা যদি তাদেরকে ত্যাগ করো, তবে আপন কথা অনুযায়ী কুরআনের বিধান ত্যাগকারী হবে। আর যদি তাদের সাথে এবং তোমাদের সঙ্গ ত্যাগকারীদের সাথে যুদ্ধ করো, তবে সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। তারা অতি সহজেই তোমাদের পরাস্ত করে তোমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিবে।

www.pathagar.com

কা'কা'র একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এ সম্পর্কে কি বলছো ?

কা'কা' জবাব দিলেন ঃ

এ সমস্যার সমাধান যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই করা যেতে পারে। আপনারা যদি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত করেন, তাহলেই উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আর আমরা ঐকবদ্ধ্য হয়ে অতি সহজে উসমান হন্তাদের প্রতিশোধ নিতে পারবো। কিন্তু আপনারা যদি বিভেদের পথ অনুসরণ করেন, তবে মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা সমগ্র কল্যাণকামী জাতির জন্য দারুণ দুঃখের কারণ হবে। মুসলমানদের ঐক্য দুর্বল হয়ে যাবে। উসমানের প্রতিশোধও নেয়া যাবে না। তাই আপনারা শান্তি ও শৃংখলার সাথে গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করুন। যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে শান্তি-শৃংখলাকে প্রাধান্য দিন। ভাইদেরকে একে অন্যের দুশমন বানানোর পরিবর্তে তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করে কাছে আনার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, মুসলমানদের মধ্যে যদি একবার বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে তা কেবল আমাদের জন্য নয়, আপনাদের জন্যও ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে।

একথা শুনে তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তিনজনেই সমস্বরে বললেন ঃ

তোমার অভিমত সম্পূর্ণ সঠিক। তুমি আলীর কাছে যাও। তাঁর মতও যদি তোমার মতের অনুরূপ হয়, তবে ব্যাপারটি সহজেই মীমাংসা হয়ে যাবে।

কা'কা' কূফা পৌছলেন এবং একথা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন। তিনি খুব খুশী হলেন এবং স্বীয় দূত মারফত ঐ তিনজনকে বলে পাঠালেন যে, আমি কা'কা'র কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং সন্ধির কথাবার্তা আরম্ভ হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার লশকরের মধ্যেই এরূপ হাঙ্গামাকারীদের কমতি ছিলো না, যারা সন্ধির কথাবার্তা চলা পসন্দ করতো না। এ সন্ধি ছিলো তাদের জন্য মৃত্যু সমতুল্য। তাই তারা তাদের পরিকল্পনা মাফিক পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে করে ফেললো যে, তা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উভয়ের আয়ত্তের বাইরে চলে গেলো। উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হলো।

তবু সন্ধির আশা একদম তিরোহিত হয়নি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তো শুরু থেকেই সন্ধি কামনা করছিলেন। তালহা ও যুবায়রও চিন্তা-

www.pathagar.com

ভাবনা করার পর এ সিদ্ধান্তই স্থির করলেন যে, তারা ভুলের মধ্যে আছেন। কোনোক্রমেই হযরত আলীর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়। তাই একদিন যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে, চিন্তা-ভাবনার পর আমি তো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমরা সম্পূর্ণ ভ্রান্তির মধ্যে আছি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কি করতে চাও ! তিনি বললেন, আমি লশকর থেকে আলাদা হয়ে ফিরে যেতে চাচ্ছি।

অনেক সময় উভয় পক্ষের সহানুভূতিশীল লোকেরা ভাইয়ের মতো একে অপরকে উপদেশ দিতেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিতেন। একবার হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর লশকর থেকে বাইরে চলে আসেন এবং তিনি যুবায়রকে ডেকে বলেন ঃ

হে যুবায়র ! তোমার ফিরে যাওয়ার মধ্যেই তোমার জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

যুবায়র জবাব দিলেন ঃ

এখন আমি কিভাবে ফিরে যেতে পারি ? তুমি দেখতে পাচ্ছো না উভয় দল কিভাবে ইস্পাতের মতো মুখোমুখি দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় যদি আমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, তবে সারা জীবন আমার শিরে কলংক-টিকা এঁটে থাকবে। আমি এ অপমান কিভাবে সহ্য করবো ?

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

এ দুনিয়ার লজ্জা ও অপমান আখেরাতের লজ্জা, অপমান ও দোযখ অপেক্ষা অনেক উত্তম।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উপদেশবাণী যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে এমন প্রভাব সৃষ্টি করলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ যখন তার পিতার এ সংকল্পের কথা জানতে পারলো, তখন তাঁর কাছে ছুটে গেলো এবং বিভিন্নভাবে তাঁকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো। কিন্তু যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি শপথ করেছি, আলীর বিরুদ্ধে আমি কখনো যুদ্ধ করবো না। একথা শুনে আবদুল্লাহ বললো, আপনি আপনার শপথের কাফফারা দিন এবং যুদ্ধ করুন।

পরস্পরের মধ্যে সলা-পরামর্শ চলছে এমতাবস্থায় কা'ব ইবনে সূর হযরত আয়েশার কাছে এসে বললো ঃ

www.pathagar.com

আলীর ফৌজ যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প করেছে। আপনি আপনার হাওদাজে আরোহণ করে চলুন। হয়তো আপনার কারণে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থির হবে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর হাওদাজে আরোহণ করলেন এবং তাঁকে চারদিক থেকে লৌহবর্ম দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর লশকরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ইতোমধ্যে শোরগোল শুনা গেলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, এ শোরগোল কিসের ? লোকেরা বললো, আলীর লশকর আমাদের লশকরের ওপর হামলা করেছে। ফলে তিনিও বাধ্য হয়ে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। উভয় দল বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো এবং সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে গেলো।

সমগ্র ঘটনার ওপর দৃষ্টি বুলালে বুঝা যায় যে, উষ্ট্রযুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বিশেষ কোনো মতবাদকে সামনে রেখে সংঘটিত হয়নি। আর না এ যুদ্ধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সামনে কোনো যৌথ মূল্যমান ছিলো। সে সময় মুসলিম জাহানে মাত্র দু'টি সংগঠিত দল ছিলো। একটি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এবং আরেকটি হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর। কিন্তু উষ্ট্রযুদ্ধে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধী পক্ষের আদৌ এ উদ্দেশ্য ছিলো না যে, আলী ইবনে আবী তালিবের শক্তিকে চূর্ণ করে মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানকে শক্তিশালী করা হবে। কেননা, তালহা ও যুবায়রের মধ্য থেকে কেউ না হযরত মুআবিয়ার কোনো সেনাদলের সিপাহলাসার ছিলেন, না তাঁর আওতাধীন অঞ্চলসমূহের মধ্য থেকে কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা। মুআবিয়া তো দূরের কথা, পরস্পরের মধ্যেও এরা কোনো এক ব্যক্তির রাজত্বের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি পরাজিত হতেন, তবু নির্ঘাত তালহা ও যুবায়রের মধ্যে কেউই অন্য কাউকে নিজেদের শাসক বলে মেনে নিতে রাযী হতেন না।

বস্তুত এরা দু'জনই নিজেদের জন্য রাজত্বের অভিলাষী ছিলেন। তারা চাইতেন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যেনো তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ না করেন। কিন্তু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বাসনা পূর্ণ করতে এবং তাদের পরামর্শ মতো চলতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তখন এরা নিরাশ হয়ে মদীনা থেকে চলে আসেন এবং মক্কা এসে সংস্কার-পতাকা উত্তোলন করেন। সৈন্য পরিচালনা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো কেবল হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের জন্য ইরাক ও ইয়ামেনের

www.pathagar.com

রাজত্ব লাভ করা এবং খলীফাকে নিজেদের পরামর্শের পাবন্দ বানিয়ে মজলিসে শূরার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করা। তারা তাদের এ অভিলাষ মদীনায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে প্রকাশ করেছিলেন।

উষ্ট্রযুদ্ধে তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশগ্রহণের কারণ আমাদের মতে এটাই, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা এবং ঐ যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের কারণ ছিলো সেই পুরাতন ক্ষোভ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে চলে আসছিলো। হয়তো এ ক্ষোভ মনের মধ্যেই চাপা থাকতো এবং তা প্রকাশ করার সুযোগ ঘটতো না। কিন্তু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত লাভের পূর্বে ওপরে যেসব ঘটনা ঘটে আর যেভাবে মদীনা ফেতনা-ফাসাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যে নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেরেমে মযলুম তৃতীয় খলীফার রক্ত ঝরানো হয় এবং তারপর যেভাবে বিদ্রোহীরা নিজেদের ইচ্ছা মতো দেশের হর্তাকর্তা সেজে যাচ্ছে–তাই শুরু করে দেয়, তাতে গোটা দেশে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চতুর্দিক থেকে মযলুম খলীফার প্রতিশোধ নেয়ার আওয়াজ বুলন্দ হয়। এ দাবী এতোই কঠিন রূপ পরিগ্রহ করে যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকেও তা সমর্থন করা ও লশকরের নেত্রীত্ব গ্রহণ করতে হয়। তবু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, তখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অন্তরের অন্তস্তলে সেই ঘটনাবলীও লুক্কায়িত ছিলো।

অপবাদের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা বর্ণনা করেছিলাম, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতামত জানতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি বলেন যে, আপনার চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। আয়েশা ছাড়া আরো অনেক মহিলা আছেন। আপনি তাকে তালাক দিয়ে তাদের একজনকে বিবাহ করে নিন।

এরূপ পরামর্শদানের ফলে হযরত আয়েশার মনে যে পরিমাণ ক্ষোভই সৃষ্টি হোক না কেনো, তা কম ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ পরামর্শ দান করা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে মোটেই শোভনীয় ছিলো না। এটা মোটেই ইনসাফের কথা হতো না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিছক এমন একটি কারণে হযরত আয়েশাকে তালাক দিয়ে দিতেন, যা পাপাত্মা মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও কলহ বাধানোর জন্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দিলে সঙ্গতভাবে এটাই বুঝা যেতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চরিত্রকে (নাউযুবিল্লাহ) সন্দেহযুক্ত পেয়ে তাকে নিজের থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় দুর্নাম কেবল হযরত আয়েশারই হতো না, বরং তার আওতায় তাঁর মুহতারাম পিতা ও পরিবারের সমস্ত সদস্যও এসে যেতো। আর অপমানের এ দাগ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে দূর হতো না। ব্যাপারটি এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো না। বরং মুনাফিকদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা করারও পথ খুলে যেতো আর এ পাপাত্মা গোষ্ঠী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই এক বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টির এবং দুর্বল ঈমানদারদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে সফলকাম হতো। আশ্চর্যের বিষয়, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি থেকে একথাগুলো কিভাবে উধাও হয়ে গেলো ! আর তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ পরামর্শ কিভাবে দিলেন, যা ইনসাফ ও যুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিলো। এটা ঠিক যে, তিনি এ পরামর্শ নিছক এজন্য দিয়েছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযযত ও সম্মানের বড় পাহারাদার ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোনো কলংক আসা তাঁর জন্য যারপরনাই অসহনীয় ছিলো। তবু তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এ ধরনের মন্তব্য না করাই উচিত ছিলো।

এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উষ্ট্রযুদ্ধের সময় যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। নিঃসন্দেহে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দেয়ার পরামর্শ দিয়ে ভুল করেছিলেন। কিন্তু অপরদিকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্ষোভের দরুন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলা করার ক্ষেত্রেও চরম ভুল করেছেন।

তবু এখানে এ বিষয়টি বলে দেয়া প্রয়োজন যে, পরবর্তীতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এ কাজে খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, হায় ! আমি যদি উষ্ট্রযুদ্ধের পূর্বেই মারা যেতাম। হায় ! আমার গর্ভে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দশটি সন্তান হতো এবং তারা সবাই মারা যেতো ! কিন্তু উষ্ট্রযুদ্ধ যদি সংঘটিত না হতো।

যখন উষ্ট্রযুদ্ধের কথা আলোচনা হতো, কাঁদতে কাঁদতে তার দম বন্ধ হয়ে আসতো এবং চোখের পানিতে তাঁর চাদর ভিজে যেতো।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য আর তা হচ্ছে, বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কখনো কোনো অশোভন

www.pathagar.com

উক্তি করেননি। বানু উমাইয়া খোলাখুলিভাবে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উসমান হত্যার অপবাদ আরোপ করতো। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওপর কখনো এ ধরনের কোনো অপবাদ দেননি। বরং সর্বদা তাঁর পরহেযগারী ও খোদাভীতির প্রশংসাই করেছেন। অনেক সময় একথাও বলতেন যে, আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলো।

নিঃসন্দেহে তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কিন্তু এমন কোনো কথা বলেননি, যা ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি করতো। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর কখনো ছিলো না। এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে সন্ধির মনোভাব প্রকাশ করার পর তিনি তাঁর পক্ষ থেকেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু কোনো কোনো ফাসাদী ও ফেতনাবাজ লোকের চক্রান্তে সন্ধির এ আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। হযরত আয়েশার আশাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত উষ্ট্রযুদ্ধের মতো ভীতিপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয়।

এ ঘটনা ইসলামী ইতিহাসের মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর অন্যতম এবং এর মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য বহু উপাদান নিহিত আছে।

www.pathagar.com

নারীর অধিকার

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন আমাদেরকে বলে দেয় ইসলাম নারীদেরকে কি অধিকার দান করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সদাচার করে উম্মতকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন নারী কি কি অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী।

স্মর্তব্য যে, যেখানে স্বামীর ওপর স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে, সেখানে স্ত্রীর ওপরও স্বামীর কিছু অধিকার রয়েছে। যেখানে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে গার্হস্থ্য কাজে স্ত্রীর সহযোগিতা করা, তার প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা, তার সাথে সদাচরণ করা ও তার মনোরঞ্জন করতে ত্রুটি না করা, তেমনি স্ত্রীরও কর্তব্য হচ্ছে, এমন সুন্দরভাবে গৃহকর্ম আঞ্জাম দেয়া, যাতে স্বামীর কোনো অভিযোগ না থাকে, স্বামীর আরাম-আয়েশের প্রতি খেয়াল রাখা, সন্তানের তত্ত্বাবধান ও তরবিয়াত করা এবং এরূপ মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে গৃহ জান্নাতে পরিণত হয়।

আল্লাহ তাআলা নারীর প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করেছেন তাঁর গৃহকে। রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা তার উচিত নয়। বিশেষত এরূপ অবস্থায় তো তার রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা উচিত যখন দেশে অস্থিরতা ও গণ্ডগোল চলতে থাকে এবং সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন জ্বলতে থাকে। নেতৃত্ব নারীর জন্য সহজসাধ্য নয়। যে জাতির নেতৃত্বে কোনো নারী অধিষ্ঠিত রয়েছে, সে জাতির লক্ষ্য খুব কমই হাসিল হয়ে থাকে। নারীকে আল্লাহ ঘরকন্না করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাকে টানা-হেঁচড়া করলে, তা দেশ ও জাতির জন্য অধঃপতনের কারণ হতে পারে। নারী যদি রাজনৈতিক ময়দানে চক্কর মারতে থাকে, তবে সে ঘর সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাবে। বাচ্চা-কাচ্চার শিক্ষা-দীক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে পারবে না। এর যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব দেশের নতুন প্রজন্মের ওপর পড়তে পারে, তা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পারিবারিক জীবন ছিলো খুব সাফল্যজনক। তিনি সম্পূর্ণভাবে ছিলেন তাঁর ঘরের মালিক-মুখতার। আর তাঁর সম্ভ্রান্ত স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহ-কর্মে সবসময় তাঁকে সহযোগিতা করতেন। যতক্ষণ ঘরে অবস্থান করতেন, কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত থাকতেন।

www.pathagar.com

এদিকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও যথাসম্ভব তাবলীগ ও হিদায়াত এবং তালীম-তালকীনের কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করতে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধের ওপর যে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়েছিলো, তা লঘু করার ক্ষেত্রে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

সুতরাং যে পর্যন্ত দুই পক্ষের অধিকারের প্রশ্ন ছিলো কোনো পক্ষের তরফ থেকেই অপর পক্ষের অধিকারের ক্ষেত্রে ত্রুটি হতো না এবং উভয়ই নিজ নিজ শ্রেণীর জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন।

হযরত আয়েশা রাজনীতিতে অবশ্যই অংশ নিয়েছেন। কিন্তু তার কারণ প্রথমত এই ছিলো যে, তিনি বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুরুষদের চেয়েও অগ্রসর ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন মহা মানবের স্ত্রী ও একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। প্রত্যেক লোক তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তাঁর নির্দেশের সামনে মাথানত করতে বাধ্য ছিলো। একজন নেতার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, শিক্ষা-দীক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় যেখানে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন, সেখানে বংশ মর্যাদার দিক থেকেও তাঁর প্রসিদ্ধি থাকতে হবে। সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন মানুষ তাঁর কথা মান্য করতে প্রস্তুত থাকবে। যা হোক, কতকটা তাঁর প্রকৃতিগত যোগ্যতা ও কতকটা রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কারণে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে রাজনীতিতে অংশ নিতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক নারীকে হযরত আয়েশার অনুসরণে রাজনৈতিক ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন। কদাচিত কোনো নারী সত্যিকার অর্থে নেত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। সুতরাং নারী সমাজ রাজনৈতিক ময়দান থেকে যতটা দূরে থাকবে, ততটাই তার জন্য মঙ্গল। অবশ্য পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিঃসন্দেহে অন্যান্য নারীর জন্য আদর্শ ছিলেন। আর এ বয়সে নারী সমাজকে তাঁর অনুসরণ অবশ্যই করা উচিত।

আজকাল নারী অধিকারের প্রচারকরা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করছেন। তারা বলছেন, কোনো শ্রেণীর ওপর কোনো শ্রেণীর কোনো রকমের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকা উচিত নয়। উভয়েরই সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র, শারীরিক গঠন ও স্বভাব-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ দাবী সম্পূর্ণ অকার্যকর মনে হয়। এর পরিবর্তে যদি নারীকে তার সঙ্গত অধিকার আদায় ও তাকে যুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করার অভিযান শুরু করা হয়, তবে তার দ্বারা সুফল লাভ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

কুরআন কারীম সর্বপ্রথম গ্রন্থ—যা এ সত্যকে স্বীকার করেছে এবং নারী ও পুরুষের অধিকার আদায় করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"যেভাবে রীতি অনুযায়ী নারীদের ওপর পুরুষদের জন্য কিছু করণীয় আছে, তেমনি পুরুষদের ওপরও নারীদের জন্য কিছু করণীয় আছে (যা করা খুবই প্রয়োজন। অবশ্য যেহেতু নারী সৃষ্টিগত দুর্বল) তাই তাদের ওপর পুরুষদের কিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীর জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার সবগুলো দ্বারাই ভূষিত করেছেন।

কুরআনে কারীম নারীকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, তা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অনুরূপ। তা এক চিরন্তন সত্য, যা কখনো পরিবর্তন হবার নয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করার দাবীদারদের কাছে এ সত্যটি আজ না হলেও আগামীতে অবশ্যই ধরা পড়বে। যে দাবী প্রকৃতিসম্মত নয়, তা কখনো আদায় হতে পারে না।

বস্তুত নারী ও পুরুষ একে অপর থেকে অনেক ভিন্ন। আর এ ভিন্নতা এতোই সুস্পষ্ট যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন কাজকর্মও একে অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনের দিক থেকেও তারা একে অপর থেকে একেবারে আলাদা। এমনকি উভয়ের অনুভূতি ও মন-মানসিকতাও একে অপর থেকে পৃথক হয়ে থাকে। ঘরকন্না—যেমন রান্না-বান্না, সেলাই-পরাই, শিশুদের লালন-পালন নারীরা যে সুন্দরভাবে করতে পারে, পুরুষরা সেরূপ করতে পারে না। নারী ও পুরুষের দায়িত্বও একে অপর থেকে আলাদা। পারিবারিক কাজকর্ম দেখাশুনা করার দায়িত্ব প্রকৃতি নারীর ওপর বর্তিয়েছে। আর জীবিকা অর্জন ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের ওপর অর্পণ করেছে।

নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র যখন একে অপর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, উভয়কে একই রকম অধিকার দ্বারা ভূষিত করা এবং তাদের মধ্যে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অসম্ভব। আর এটা যারা দাবী করে, তারা নিজেদেরকেই

www.pathagar.com

ধোকা দিচ্ছে মাত্র। যারা জোর করে উভয়কে একই রকম অধিকার দ্বারা ভূষিত এবং উভয়ের মাঝে পূর্ণ সমতা কায়েম করতে চায়, তারা মূলত পরিবারের ইমারতকে বিধ্বস্ত করতে তৎপর রয়েছে। তাদের ধারণা মতে পরিবার হচ্ছে একটি বেড়ী, যা সমাজ জোর করে মানুষের গলায় পরিয়ে রেখেছে। একটি শিকল নারীর উন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের জন্য পরিবারকে ধ্বংস করা আবশ্যক। কিন্তু তাদের দৃষ্টি এ সত্যের ওপর পড়ে না যে, পরিবার ধ্বংস হওয়ার মানে সমাজ ধ্বংস হওয়া। পরিবার নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যকার মায়া-মমতা এবং সহানুভূতি ও ঐক্যের ইমারতও ধড়াস করে ভূপাতিত হয়। এমতাবস্থায় পুরুষ ও নারী এমন এক মেশিনের যন্ত্রাংশে পরিণত হয়, যা আবেগ-অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে আপন কাজ করে যায়। আর এটা মানুষের জন্য কত মারাত্মক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পুরুষ ও নারীর মধ্যকার পূর্ণ সমতার দাবী একটি প্রতারণা ও একটি অকার্যকর দর্শন। প্রকৃতিসম্মত সঠিক পথ হচ্ছে নারীকে তার বৈধ অধিকার প্রদান করা এবং তার যেসব অধিকার লংঘন করা হচ্ছে, তা সর্বতোভাবে রুদ্ধ করা। সভ্যতা-সংস্কৃতির গাড়ী এভাবেই চলতে পারে এবং এদিকেই কুরআন কারীম নিম্নোক্ত ভাষায় ইশারা করেছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"পুরুষের মতো নারীরও কিছু অধিকার আছে যা আদায় করা আবশ্যক। তবে নারীর ওপর পুরুষের কিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই রয়েছে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সমতার বিষয়টির আরেকটি দিকও রয়েছে। যা বিবাহ সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। প্রশ্ন হতে পারে, পুরুষের একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখা কি ইনসাফসম্মত ? একাধিক বিবাহ করা কি এমন কোনো পুণ্যের কাজ, যা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয ? আর একাধিক বিবাহের সপক্ষে কি কোনো ঐশী বিধান ও মানব প্রকৃতির সমর্থন আছে ?

এর সহজ-সরল জবাব হচ্ছে, ইসলাম কখনো এ দাবী করেনি যে, একাধিক বিবাহ করা এমন কোনো পুণ্যের কাজ, যা তামীল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। ইসলাম একাধিক বিবাহকে না প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্যম্ভাবী সাব্যস্ত করেছে, আর না যে কারো জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার সপক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছে। একাধিক বিবাহের জন্য ইসলাম এই শর্ত

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী সাব্যস্ত করেছে যে, স্বামী সকল স্ত্রীর মধ্যে সমতা ও সুবিচার কায়েম রাখবে এবং কোনো স্ত্রীকেই অভিযোগ করার সুযোগ দিবে না।

এটা ভালোভাবেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী শরীআত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া শেষ শরীআত। যা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই এটা আবশ্যক ছিলো যে, এতে মানবজাতির সেইসব প্রয়োজন ও সংকটসমূহের প্রতি খেয়াল রাখা, যা আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য আসন্ন।

ইসলাম মানবজাতির সমস্ত সমস্যা যেভাবে সমাধান করেছে, তার চেয়ে উত্তম সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু যেসব জাতি ইসলামের পেশ করা সমাধান ত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া সমাধান খুঁজতে চায়, তাদেরকে হয়তো উদ্ভূত সমস্যা থেকে পলায়ন করতে হয়েছে, কিংবা বাড়াবাড়ি ও উভয় চরম পথ অবলম্বন করে সমস্যাকে আরো জটিলতর করেছে। একাধিক বিবাহের বিষয়টিই ধরা যাক। ইউরোপীয়রা বলছে যে, একাধিক বিবাহ আমাদের জন্য একেবারেই অসহনীয়। কিন্তু বাস্তবতা থেকে পলায়ন করার পরিণাম এই হয়েছে যে, সেখানে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। একাধিক বিবাহ অসহনীয়। কিন্তু স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীকে রক্ষিতা হিসাবে গৃহে রাখা বৈধ ও সভ্যতাসম্মত !!

মানবেতিহাসে বিভিন্ন যুগ এরূপ এসেছে যখন নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে এতোই বেড়ে গেছে যে, প্রত্যেক নারীর জন্য স্বামী যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় তো সবসময়ই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তখন কেবল পুরুষের সংখ্যাই হ্রাস পায় না, বরং হাজার হাজার লাখ লাখ নারী বিধবা হয়ে নিঃসহায় ও নিঃসংগ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধে এরূপই হয়েছে। প্রথমত সেখানে পূর্বেই পুরুষদের সংখ্যা নারীদের তুলনায় খুব কম ছিলো, দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের ধ্বংসকারিতা তাদের সংখ্যা আশংকাজনক হারে কমিয়ে দিয়েছে। ফলে যুদ্ধের পর ত্রিশ-চল্লিশ লাখ নারী এরূপ অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যাদের জন্য হয়তো স্বামীই যোগাড় হয়নি, কিংবা বৈধব্য অবস্থায় লাঞ্ছিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলো। এ অবস্থাটি সামনে রাখুন ! তারপর একাধিক বিবাহের বিষয়টি বিবেচনা করুন। একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে যত দলীলই উপস্থাপন করা হোক না কেনো, একথা মানতেই হবে যে, বৈধব্যের হীন জীবনের চিকিৎসা একাধিক বিবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। অনুরূপভাবে একাধিক বিবাহ বাহ্যত যতই অপসন্দনীয় মনে হোক না কেনো, এটা অনস্বীকার্য যে, অবিবাহিত নারীদের জন্য সারা দিন কারখানায়

www.pathagar.com

কাজ করা এবং রাতে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার চেয়ে এমন স্বামীর সাহচর্য লাভ করা উত্তম, যার পূর্ববর্তী স্ত্রী বর্তমান থাকলেও তার মতোই এর জন্যও ভালোবাসার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের পতাকাবাহী ও একাধিক বিবাহের বিরোধীরা যুক্তি হিসাবে এও বলছে যে, পুরুষদের যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকে, তাহলে নারীদের জন্যও একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি কেনো থাকবে না ?

এর জবাব হচ্ছে, এ বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। নারী যদি একই সময় একাধিক পুরুষের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সন্তান জন্ম হওয়ার পর সে তার স্বামীদেরকে কিভাবে নিশ্চয়তা দান করবে যে, অমুক সন্তান অমুক স্বামীর ? এরূপ নারীর গর্ভজাত সন্তানকে কোনো স্বামীই তার সন্তান বলে স্বীকার করবে না। এ সন্তানের ভবিষ্যত অন্ধকারময় হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অবস্থায় এ ধরনের কোনো সংকট সৃষ্টি হয় না।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে, স্ত্রীর স্বাধীনতা ও নারীর স্বাধীনতা দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। এক বিষয় নয়।

ব্যাখ্যার মধ্যে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেনো, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, বৈবাহিক সম্পর্ক কতিপয় শর্ত দ্বারা মীমাংসিত। যা কেবল স্ত্রীকেই নয়, স্বামীকেও মান্য করতে হয়। স্ত্রীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে তার জীবন-সঙ্গীর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে, আর না স্বামীর জন্য সঙ্গত যে, সে তার জীবন-সঙ্গিনীর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উদাসীন থাকবে।

কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে আজকাল বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, তা কেবল নারীর স্বাধীনতার বিষয়টি।

বর্তমান যুগের নামমাত্র স্বাধীনতার পতাকাবাহীদের ধারণা মতে প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। দাম্পত্য বিধি-নিষেধে তার আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। তারা বলছেন, এ বিধি-নিষেধ মূলত ধর্মের পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপ করা হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব নারীকে এর থেকে মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে বেড়ী তার পায়ের মধ্যে জন্মের সময় পরানো হয়েছে, তা একদম ছুঁড়ে ফেলা উচিত। এভাবে তারা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের স্তর থেকে নামিয়ে ইতর প্রাণীর স্তরে এনে দাঁড় করাতে চায়। ধর্ম মানুষকে অনাবশ্যক বিধি-নিষেধে বেঁধে ফেলেছে, এ এক মস্ত ভুল। নামমাত্র স্বাধীনতার পতাকাবাহীরা এ ধারণাই মানুষকে দিতে চায়। নারীর ওপর যে বিধি-নিষেধ

www.pathagar.com

অর্পিত হয়েছে, তা ধর্ম নয়, মানব প্রকৃতি অর্পণ করেছে। আর প্রকৃতির আরোপকৃত বিধি-নিষেধ লংঘনকারীকে সৃষ্টির সেরা নয়, বরং সৃষ্টির অধম বলাই সঙ্গত। প্রকৃতির আরোপকৃত বিধি-নিষেধ পালন করার নাম নৈতিক চরিত্র। আর নৈতিক চরিত্র (চাই দাম্পত্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, চাই অ-দাম্পত্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত) আত্মসংযমের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি আত্মসংযমী হতে পারে না, সে কখনো চরিত্রবান মানুষ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ খাবার বিষয়টি ধরা যাক। কোনো কোনো নির্দিষ্ট অবস্থা ছাড়া ধর্ম খাবার ওপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই যখন চাইবে এবং যত চাইবে খাবার অনুমতি আছে। কিন্তু যে মানুষ খানা খাবার সময় আত্মসংযমী হতে পারে না এবং খানা দেখা মাত্রই তার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেনো পাঁচ ওয়াকতের উপবাসী—সে কখনো ভদ্র মানুষ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হবে না। সর্বমহল ও সর্বস্থানে তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হবে।

দাম্পত্য বিষয়ে আত্মসংযম অপরিহার্য। এটি একটি নৈতিক মূল্যমান—যা স্বামী তার স্ত্রীর কাছে দাবী করে এবং স্ত্রী তার স্বামীর কাছে। আর তারা উভয়ে সেই সন্তানের কাছে, যে সামনে অগ্রসর হয়ে এ মূল্যমানের উত্তরাধিকারী হবে।

কোনো ব্যক্তি যদি চরিত্রহীনা নারীকে ঘৃণা করে, তবে সে তাকে এজন্য ঘৃণা করে না যে, সে নারী ধর্মের কোনো নির্দেশ অমান্য করেছে, বরং এজন্য তাকে ঘৃণা করে যে, সে প্রকৃতির নির্দেশ অমান্য করেছে। আর প্রকৃতির নির্দেশ অমান্যকারীকে সভ্য মানুষের সমাজে কোথাও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না।

নিশ্চিতরূপেই ধর্ম মানুষের ওপর দাম্পত্য বিষয় সম্পর্কে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু তা যুলুম রূপে নয়। বরং নিছক এজন্য যে, মানব প্রকৃতি ঐ বিধি-নিষেধগুলো দাবী করতো। ঐ বিধি-নিষেধগুলো দ্বারা চরিত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়। মানবজাতিকে চারিত্রিক বিধি-নিষেধে বেঁধে দিয়ে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

সুতরাং যে ধর্ম এসব বিধি-নিষেধ স্বীকার করে, সে সুস্থ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে এরূপ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষকে মাতাপিতা কর্তৃক স্বাধীনতা দানের আকাংখী, সে মূলত মানবজাতির ওপর নিকৃষ্টতম যুলুম চাপিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির ডাককে অস্বীকার করে মানবতাকে ধ্বংসের ভয়াবহ গুহার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কাজেই প্রকৃত মূল্যমান হচ্ছে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করবে এবং অপ্রাকৃতিক বিষয় থেকে দূরে থেকে নিজকে ইতর প্রাণী হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

www.pathagar.com

আইনুল ইসাবা

জালালুদ্দীন সুয়ূতী

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

এ পুস্তিকার নাম রেখেছি আমি 'আইনুল ইসাবা' (সঠিক সিদ্ধান্ত)। সাহাবা কিরামের সাথে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মতানৈক্যমূলক কতিপয় মাসআলা আলোচিত হয়েছে এ পুস্তিকায়। এতদসংক্রান্ত ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী কর্তৃক লিখিত 'আল ইজাবা' পুস্তকের সারসংক্ষে হচ্ছে এ পুস্তিকাটি। কিন্তু সংক্ষেপ করা সত্ত্বেও আমি এদিকে লক্ষ্য রেখেছি যে, যদি এ বিষয় সম্পর্কে আমি নতুন কোনো কথা অবগত হই, তবে তা আমার পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করবো।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বিভিন্ন জ্ঞানগত ও ফিক্‌হী মাসায়েলের মধ্যে অন্যান্য সাহাবার সাথে যে মতদ্বৈধতা করেছেন, এ পুস্তিকায় সেইসব মতদ্বৈধতাই উল্লিখিত হয়েছে। এখানে এ সত্যটি প্রকাশ করা আবশ্যক যে, এ বিষয়ে লিখিত শায়খ বদরুদ্দীন যারকাশীর উপরোক্ত পুস্তকটিই প্রথম পুস্তক নয়। বরং তাঁর পূর্বেও খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিস উস্তাদ আবু মনসুর ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে তাহির আল বাগদাদী এরূপ একটি পুস্তক লিখেছেন। যদিও তা খুব সংক্ষিপ্ত এবং তাতে মাত্র পঁচিশটি মাসআলা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুকবিলের মাধ্যমে আমি তা অবহিত হয়েছি।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকার (ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী) আল ইজাবা পুস্তকে এবং হাকেম তাঁর মুসতাদরাক এ উরওয়ার একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

আমি হালাল ও হারামের মাসআলা, ইলম ও শাস্ত্র, কবিতা ও চিকিৎসা বিদ্যায় হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে বড় কাউকে ওয়াকিফহাল দেখিনি।

হাকেম উরওয়ার আরো একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

আমি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, সুন্নাত ও ফরযসমূহ তো আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিখেছেন। কবিতা ও আরবী ভাষার জ্ঞান আপনি আরব কবি ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে লাভ করেছেন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র কার মাধ্যমে শিখেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পীড়িত ছিলেন, তখন আরবের চিকিৎসকগণ তাঁর কাছে আগমন করতেন। আমি তাদের কাছ থেকে এ শাস্ত্র শিক্ষালাভ করেছি।

মাসরূক বলেন ঃ

আল্লাহর কসম ! আমি সাহাবাদেরকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে মীরাসের মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে শুনেছি।–(মুসতাদরাকে হাকেম)

আতা বলেন ঃ

জনগণের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে বড় ফকীহ, আলেম ও বিচারক অন্য কেউ ছিলেন না।–(মুসতাদরাকে হাকেম)

ইমাম যুহরী বলেন ঃ

যদি সমস্ত সাহাবার ইলম একত্র করা হয়, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীগণের ইলমও তার সাথে যোগ করা হয়, তবু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইলম তাদের সবার একত্রিত ইলমের চেয়ে বেশী হবে।–(মুসতাদরাকে হাকেম)

মূসা ইবনে তালহা বলেন ঃ

www.pathagar.com

আমি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে বড় বাকপটু আর কাউকে দেখিনি।–(মুসতাদরাকে হাকেম)

আহনাফ উল্লেখ করেন ঃ

আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য শাসনকর্তা ও আমীর-উমারার বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু যে জাঁকজমক, ভাষার অলংকার ও বাকপটুত্ব হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বক্তৃতার মধ্যে দেখতে পেয়েছি, তা অন্য কারো বক্তৃতায় ছিলো না।–(মুসতাদরাকে হাকেম)

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং বলেন ঃ

আমি গর্ব করছি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন নয়টি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা আমার পূর্বে মারইয়াম বিনতে ইমরান ছাড়া আর কোনো নারীকে দান করা হয়নি। আর তা হচ্ছে ঃ

১. বিয়ের আগে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে মাত্র সাত বছর বয়সে বিবাহ করেন।

৩. রুখসাত তথা পিত্রালয় থেকে স্বামীর ঘরে তুলে নেয়ার সময় আমার বয়স ছিলো নয় বছর।

৪. আমাকে ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোনো কুমারী নারীকে বিবাহ করেননি।

৫. আমার লেপ ছাড়া আর কোনো স্ত্রীর লেপের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাযিল হয়নি।

৬. আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলাম।

৭. আমার সম্পর্কে কুরআন কারীমের আয়াত নাযিল হয়েছে।

৮. আমি ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর কোনো স্ত্রী জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পাননি।

৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হুজরায়ই ইনতিকাল করেন এবং ইনতিকালের সময় হুজরার মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলো না।–(মুসতাদরাকে হাকেম)

www.pathagar.com

পবিত্রতা

(গোসলের মাসায়েল)

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, উম্মুল মু'মিনীন ! জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলছেন যে, শরঈ গোসলের জন্য বীর্য বের হওয়া শর্ত।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ

জাবির ভুল বলছে। বীর্য বের হওয়া ছাড়াও গোসল ওয়াজিব হয়। বীর্য বের হওয়া ছাড়া যদি রজম ওয়াজিব হতে পারে, তবে গোসল কেনো ওয়াজিব হবে না ?

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতার মাধ্যমে এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন ঃ

ইবনে উমরের ফতওয়া ছিলো চুম্বন গ্রহণ করলে উযু ভেঙ্গে যায়। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা শুনে বললেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় চুম্বন গ্রহণ করতেন। কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না।–(সুনানে দারা কুতনী)

উবায়দ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবগত হলেন যে, ইবনে উমর নারীদেরকে তাদের চুলের খোঁপা খুলে গোসল করতে বলেন। তিনি বললেন ঃ ইবনে উমর একথা কেনো বলে না যে, গোসল করার সময় নারীরা তাদের মাথাই মুণ্ডিয়ে ফেলবে। আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। কিন্তু আমি কখনো আমার মাথার খোঁপা খুলিনি। বরং তার ওপর দিয়ে কেবল তিন আঁজলা পানি বইয়ে দিতাম।

–(মুসলিম ও নাসাঈ)

আবু মানসুর বাগদাদী তাঁর কিতাবে আবদুর রহমান ইবনে হাতিবের একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন ঃ যে ব্যক্তি মুরদারকে গোসল করাবে, সে পরে নিজেও গোসল করবে। আর যে ব্যক্তি জানাযাকে কাঁধে করে নিবে, সে উযু করবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা শুনে বললেনঃ মুসলমানদের মুরদার কি অপবিত্র যে, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গোসল করা আবশ্যক হবে ? আর কেউ যদি জানাযাকে কাঁধে করে নেয় (আর পরে উযু না করে), তবে তাতে দোষের কি আছে ?

www.pathagar.com

সালাত

(নামাযের মাসায়েল)

আবু সালামা উল্লেখ করেন যে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাত দিয়ে বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি বেতের পড়েনি, তার নামায হয়নি।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা অবগত হয়ে বললেন ঃ আমরা সবাই আবুল কাসেমকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) বলতে শুনেছি এবং এখন পর্যন্ত আমরা ভুলিনি যে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মতো পূর্ণ রুকূ-সেজদা সহকারে আদায় করতে থাকে এবং তাতে ত্রুটি করে না, সে আল্লাহর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছে যে, তিনি তাকে আযাব দিবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি ত্রুটি করবে, সে অঙ্গীকার নেয়নি। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছা করলে আযাব দিবেন।১-(মুজ্জাম তাবারানী

আবুল কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবগত হলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ নারী সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ভেঙ্গে যায়। তিনি বললেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। আমি তার সামনে শুয়ে থাকতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেজদা করতে লাগতেন, তখন হাত দ্বারা আমার পা নাড়াতেন। আমি আমার পা সংকুচিত করে নিতাম। আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখন পুনরায় পা ছড়িয়ে দিতাম।

আবু নুহায়ক উল্লেখ করেন যে, একবার আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি বেতের না পড়ে নিদ্রা যাবে এবং ফজরের নামাযের সময় তার চোখ খুলবে, সে বেতের আদায় করতে পারবে না। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহার একথা অবগত হয়ে বললেন ঃ

---

১. এ হাদীস বর্ণনা দ্বারা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, বেতেরের নামায ফরয নয়, বরং সুন্নাত। যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, বেতেরের নামায আদায় না করলে অন্য নামাযও কবুল হয় না, তবে ঐ ব্যক্তিকে আযাবের উপযুক্ত মনে করা অনিবার্য হয়। অথচ আযাবের প্রকৃত উপযুক্ত হচ্ছে ফরয ত্যাগকারী—সুন্নাত ত্যাগকারী নয়।-(অনুবাদক)

www.pathagar.com

আবু দারদা ভুল বলছেন। কোনো কোনো সময় রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেতের নামায অনাদায়ী থেকে যেতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ফজরের নামাযের সময় আদায় করতেন।

–(সুনানে বায়হাকী)

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায পড়া জায়েয মনে করতেন না। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা অবগত হয়ে বললেন ঃ উমর ভুল শুনেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোনো নামায পড়তে নিষেধ করেননি। বরং কেবল অপেক্ষা করে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।–(সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

জানাযা

(জানাযার মাসায়েল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ একবার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

আমি বলে পাঠিয়েছিলাম যে, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে নববীতে নিয়ে আসা হোক। তাহলে আমরা নারীরাও জানাযা নামাযে শরীক হতে পারবো। কিন্তু লোকেরা তা খারাপ মনে করেছে।

একথা বলে তিনি বলেন ঃ মানুষ কত তাড়াতাড়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনাবলী ভুলে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহল ইবনে বায়যাদের জানাযা মসজিদেই পড়িয়েছিলেন।–(সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আবী মালাকিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফানের এক কন্যা মারা গেলো। আমরা সমবেদনা জানানোর জন্য তাঁর গৃহে গেলাম। সেখানে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে (যিনি তাঁর ভগ্নীর মৃত্যুতে ক্রন্দন করছিলেন) বললেন ঃ ক্রন্দন করো না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মাইয়েতকে তার গৃহবাসীরা ক্রন্দন করলে আযাব দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও এরূপ বলতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা অবগত হয়ে বললেন ঃ

আল্লাহ তাআলা উমরের ওপর রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেননি যে, কোনো ব্যক্তি ক্রন্দন করলে মু'মিনকে আযাব দেয়া হয়। বরং তিনি বলেন যে, কাফেরকে তার গৃহবাসীরা হাপিত্যেশ করলে আরো বেশী আযাব দেয়া হয়। তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দলীল হচ্ছে কুরআন কারীম। তাতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى কিয়ামতের দিন কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।

ইবনে মালাকিয়া বলেন ঃ ইবনে উমরকে যখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ হাদীস শুনানো হয়, তখন তিনি কিছুই বলেননি।–(বুখারী, মুসলিম)

উমরাহ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাইয়েতকে তার গৃহবাসীদের

www.pathagar.com

ক্রন্দনের কারণে আযাব দেয়া হবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আবু আবদুর রহমানকে মাফ করুন। তিনি মিথ্যা তো বলেননি, কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি ভুলে গেছেন। কিংবা তিনি ভুল বুঝেছেন। ঘটনা কেবল এতটুকু হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী মহিলার জানাযার কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তার গৃহবাসীরা তখন তার জন্য বিলাপ করছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ এই লোকেরা তো তার জন্য ক্রন্দন করছে। অথচ তাকে কবরের মধ্যে আযাব দেয়া হচ্ছে।–(বুখারী ও মুসলিম)

উরওয়াহ বিনতে আবদুর রহমান উল্লেখ করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কোনো কোনো লোকের ধারণা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখা বিশিষ্ট ইয়ামনী চাদর দ্বারা কাফন পরানো হয়েছিলো। এটা কি ঠিক ? তিনি বলেন ঃ লোকেরা রেখা বিশিষ্ট ইয়ামনী চাদর এনেছিলো বটে, কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়নি।

–(মুসলিম)

ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করতেন যে, বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই কূপের কাছে যান, যার মধ্যে মক্কার কাফেরদের লাশসমূহ হেঁচড়িয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো এবং বলেন ঃ এখন তো তোমরা জ্ঞাত হয়ে থাকবে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য ছিলো। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ মুরদাররা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে ? তিনি বললেন ঃ আমি যা বলছি, তা তারা এখন পর্যন্ত শুনছে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন ইবনে উমরের এ বর্ণনা অবগত হলেন, তখন বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এখন তারা অবগত হয়েছে যে, আমি যাকিছু বলতাম, তা সত্য ছিলো।

–(তাবারানী)

একবার আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের সামনে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে বান্দা আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করা পসন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে মিলিত হওয়া পসন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে বান্দা আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করা পসন্দ করে না, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে মিলিত হতে চান না।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর রিওয়ায়াতকৃত এ হাদীস অবগত হলেন, তখন বললেন, আল্লাহ তাআলা তার

www.pathagar.com

ওপর রহম করুন। তিনি হাদীসের শেষ অংশ তো বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রথম অংশ ছেড়ে দিয়েছেন। পূর্ণ হাদীসটি এরূপ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ করতে চান, তখন তার মৃত্যুর বছর একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন। ঐ ফেরেশতা তাকে সময় সময় জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকেন এবং তাকে সিরাতে মুসতাকীমের ওপর দৃঢ়পদ রাখেন। যখন ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আসে, তখন ফেরেশতা তার শিয়রে বসেন এবং বলেন ঃ হে নফসে মুতমাইন্না ! তুমি পার্থিব কদর্যতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বীয় প্রভুর দরবারে হাযির হতে যাচ্ছো। যেখানে তোমার জন্য সব রকম নেয়ামত বিদ্যমান রয়েছে, তুমি সেখানে আল্লাহ তাআলার দীদারও লাভ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে সেই সময় যখন সে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়। আর আল্লাহ তাআলা তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আগ্রহী হন। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে আযাব দিতে চান, তখন তার মৃত্যুর বছর একটি শয়তান তার ওপর প্রবল করে দেন। যে তাকে সরল পথ ভুলিয়ে পাপের পথে পরিচালিত করে। যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়, তখন মালাকুল মউত তার রূহ কবয করার জন্য উপস্থিত হন। তখন ঐ শয়তান তার শিয়রে বসে পড়ে এবং বলে ঃ হে অমুক ! আল্লাহর দরবারে তোমার উপস্থিতির সময় এসেছে। আর আল্লাহর গযব ও আযাব তোমার ওপর পতিত হওয়ার সময় আসন্ন। এটিই হচ্ছে সেই সময়, যখন আল্লাহ তাআলা তার সাথে (সন্তুষ্ট অবস্থায়) মিলিত হতে অপসন্দ করেন।–(দারা কুতনী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইনতিকালের নিকটবর্তী সময়ে নতুন কাপড় আনিয়ে পরিধান করেন এবং বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, মানুষ যে কাপড় পরিধান করে ইনতিকাল করবে, কিয়ামতের দিন সেই কাপড়েই তাকে জীবিত করা হবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু যখন একথা অবগত হলেন, তখন বললেন ঃ

আল্লাহ তাআলা আবু সাঈদের ওপর রহম করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার অর্থ তা ছিলো না, যা আবু সাঈদ বুঝেছে। বরং তার অর্থ ছিলো–মানুষ মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে যে ধরনের আমল করবে, কিয়ামতে সেই অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কাপড়ে জীবিত করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর ও খতনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।–(আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

www.pathagar.com

আবু মানসুর বাগদাদী আবু আতিয়ার একটি রিওয়ায়াত স্বীয় গ্রন্থে বিধৃত করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

আমি এবং মাসরূক হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে হাযির হলাম। মাসরূক বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মুলাকাত পসন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে মুলাকাত করা পসন্দ করেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ

আল্লাহ তাআলা আবু আবদুর রহমানের ওপর রহম করুন। তিনি হাদীসের প্রথম অংশ তো বর্ণনা করেছেন, কিন্তু শেষ অংশ বর্ণনা করেননি। আর তোমরাও তার কাছে জিজ্ঞেস করোনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ হাদীসটি এরূপ ঃ

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার সাথে সদাচরণ করতে চান, তখন তার মৃত্যুর বছর তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। ঐ ফেরেশতা তাকে সিরাতে মুসতাকীমের ওপর পরিচালিত করেন। নেক আমল তার দ্বারা প্রকাশ পেতে থাকে। এমনকি তার মৃত্যুর পর লোকেরা বলে, অমুক ব্যক্তি উত্তম জীবনযাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। মৃত্যুর পর যখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থিত হয় এবং জান্নাতের নেয়ামত তার সামনে দেখতে পায়, তখন তার মন খুশীতে ভরে যায়। এটাই হচ্ছে সেই সময় যখন সে আল্লাহ তাআলার সাথে মুলাকাত করা পসন্দ করে এবং আল্লাহ তাআলা তার সাথে মুলাকাত করা পসন্দ করেন।

কিন্তু এর বিপরীত যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার সাথে (তার পাপের দরুন) অসদাচরণ করতে চান, তখন তার মৃত্যুর বছর একটি শয়তান তার ওপর প্রবল করে দেন। সে তাকে সরল পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহীর পথে পরিচালিত করে। অতঃপর সে যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন লোকেরা বলে, অমুক ব্যক্তি অতি মন্দ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। সে যখন পুনরুত্থিত হবে, তখন স্বীয় পাপকর্মের দরুন জাহান্নামের আযাবকে তার সামনে দেখতে পায়। তখন তার দুঃখ ও বেদনার অবধি থাকে না। এটিই হচ্ছে সেই সময় যখন সে আল্লাহ তাআলার সাথে মুলাকাত করা অপসন্দ করে এবং আল্লাহ তাআলাও তার সাথে মুলাকাত করা অপসন্দ করেন।

www.pathagar.com

রোযা

(রোযার মাসায়েল)

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাস উনত্রিশ দিনের হয়ে থাকে। লোকেরা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ তাআলা আবু আবদুর রহমানের ওপর রহম করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের জন্য উনত্রিশ দিনকে সীমাবদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছিলেন, মাস কখনো উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে। সাথে সাথে পূর্ণ হাদীসটিও বর্ণনা করেন। আর তা হচ্ছে–একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শপথ করেছিলেন যে, তিনি এক মাস তাঁর স্ত্রীদের সাথে কথা বলবেন না। এ দিনগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চিলা-কোঠায় অতিবাহিত করেন। যখন উনত্রিশ দিন হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিলাকোঠা থেকে অবতরণ করে আমার কাছে আগমন করলেন। আমি বললাম, আপনি তো শপথ করেছেন যে, এক মাস পর্যন্ত আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন না। তখন তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।–(মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল)

আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার ওয়ায করার সময় বলেন ঃ রোযার দিনে যদি কারো ভোরে গোসল করার প্রয়োজন হয়, তবে সে রোযা রাখবে না। আমি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর একথা আবদুর রহমান ইবনে হারিসের কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি তাঁর পিতার কাছে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ধরনের কোনো হাদীস শুনিনি। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। তাঁরা দু'জনই আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন এ অবস্থা দেখা দিতো, তখন তিনি রোযা কাযা করতেন না। আমরা উভয়ে সেখান থেকে উঠে মারওয়ানের কাছে গেলাম। আবদুর রহমান এসব বৃত্তান্ত তার কাছে বর্ণনা করলেন। মারওয়ান বললেন, আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি যে, তোমরা আবু হুরায়রার কাছে গমন করো এবং তার

www.pathagar.com

সামনে তার কথা খণ্ডন করো। আমরা আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলাম। আবদুর রহমান তাঁর কাছে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ সত্যিই কি তাঁরা দু'জনে এরূপ বলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আসল কথা হচ্ছে, আমি এ মাসআলা ফযল ইবনে আব্বাসের কাছে শুনেছিলাম। সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনিনি। এখন তোমরা বলছো যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলে আমি আমার অভিমত থেকে রুজু করছি।-(মুসলিম)

বাযযায স্বীয় মুসনাদে লিখছেন যে, এ হাদীসটি ছাড়া আর কোনো এরূপ হাদীস সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই, যা আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু ফযল ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

হজ্জ

(হজ্জের মাসায়েল)

সালিম বর্ণনা করেন যে, একবার ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার এ উক্তি বর্ণনা করেন যে, কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানোর পর হাজীদের জন্য স্ত্রী ও সুগন্ধি ছাড়া অন্যান্য জিনিস জায়েয হয়ে যায়। সালিম বলেন, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা শুনে বললেন ঃ স্ত্রী ছাড়া বাকী সব জিনিসই জায়েয হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইহরাম খুলে ফেলতেন, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগাতাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।–(সুনানে বায়হাকী)

উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে যে, যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলছেন, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জে যেতে পারছে না, কিন্তু কুরবানীর জন্তু হেরেমে যবেহ করার জন্য প্রেরণ করে, তার ওপর কুরবানীর জন্তু যবেহ হওয়া পর্যন্ত সেইসব জিনিস হারাম হয়ে যায়, যা একজন হাজীর ওপর হারাম হয়। আমিও আমার কুরবানীর জন্তু প্রেরণ করেছি। আপনি আমাকে লিখে জানাবেন বাস্তবিকই কি মাসআলা অনুরূপ ? উমরাহ বলেন, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে লিখে পাঠান যে, ইবনে আব্বাসের কথা ঠিক নয়। আমি আমার নিজ হাতে কুরবানীর জন্তুদের জন্য কালাদা (কুরবানীর জন্তুর গলায় পরানোর রশি) বানাতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেইসব কালাদা তাঁর নিজ হাতে কুরবানীর জন্তুদের পরাতেন। তারপর আমার পিতার সাথে সেগুলো মক্কা মুআযযমায় প্রেরণ করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের ওপর এমন কোনো জিনিস হারাম করতেন না, যা আল্লাহ তাআলা জায়েয সাব্যস্ত করেছেন।

–(সুনানে বায়হাকী)

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন যে, এ মাসআলা সম্পর্কে সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লোকদের ভুল-বুঝাবুঝি দূর করেন এবং তাদেরকে সুন্নাত-ই-নববী সম্পর্কে অবহিত করেন। যুহরী বলেন, আমাকে উরওয়াহ ও উমরাহ জানান যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, আমি কুরবানীর জন্তুদের রশি পরিয়ে দিতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো মক্কায় পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু কোনো জিনিস থেকে দূরে থাকতেন না। এমনকি

www.pathagar.com

সেই কুরবানীর জন্তু মক্কায় পৌছে যবেহ হয়ে যেতো। লোকেরা যখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ উক্তি অবগত হলো, তখন তারা তার ওপর আমল করা শুরু করলো এবং ইবনে আব্বাসের ফতওয়া ত্যাগ করলো।

–(বায়হাকী)

মুহাম্মদ ইবনে মুনতাছির বলেন, আমি ইবনে উমরের কাছে ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি আমার শরীরে আলকাতরা মাখানো পসন্দ করবো, কিন্তু ইহরাম অবস্থায় আমার শরীর থেকে আতরের সুগন্ধি আসবে, তা পসন্দ করবো না। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে যখন এ বিষয়টি উত্থাপিত হলো, তখন তিনি বললেন, আমি রাতের বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগাতাম। সকাল বেলা উঠে তিনি ইহরাম বাঁধতেন। তখন তাঁর শরীর থেকে রীতিমতো সুগন্ধির সৌরভ ছড়াতো।–(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটি উমরা আদায় করেন ? তিনি জবাব দেন, চারটি উমরা এবং তার মধ্য থেকে একটি রজব মাসে আদায় করেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হুজরা কাছেই ছিলো। উরওয়াহ ডেকে বললেন, উম্মুল মু'মিনীন ! আপনি শুনতে পাচ্ছেন আবু আবদুর রহমান কি বলছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছেন ? উরওয়া বললেন, ইনি বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি উমরা করেছেন। আর তার মধ্য থেকে একটি রজব মাসে আদায় করেছেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহ তাআলা আবু আবদুর রহমানের ওপর রহম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোনো উমরা করেননি, যাতে তিনি (ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক ছিলেন না (তা সত্ত্বেও তিনি ভুলে গেছেন)। নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে কোনো উমরা আদায় করেননি।–(বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ যে হাদীস বর্ণনা করেন, তা উপরোক্ত হাদীস থেকে কতকটা ভিন্ন। এঁরা মুজাহিদ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, কেউ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটি উমরা করেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, দু'টি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন একথা জানতে পারলেন, তখন বললেনঃ আশ্চর্য ! ইবনে উমর জানা সত্ত্বেও এরূপ কথা বলছেন ? তিনি বিদায় হজ্জের সাথে যে উমরাটি করেছিলেন, তা এর থেকে ভিন্ন।

www.pathagar.com

সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন যে, তাঁর পিতা এ ফতওয়া দিতেন যে, নারীগণ যখন ইহরাম বাঁধবে, তখন নিজেদের মোযা কেটে তাকে জুতা বানিয়ে নিবে। কিন্তু সাফিয়্যা তাকে বলেন যে, আয়েশার ফতওয়া তার বিপরীত। তিনি নারীদেরকে ইহরাম অবস্থায় মোযা কাটার নির্দেশ দেন না। একথা শুনে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ফতওয়া থেকে রুজু করেন।

–(শাফিঈ, বায়হাকী)

ইবনে দাউদ ও ইবনে খুযায়মা সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর এ ফতওয়া দিতেন যে, নারীরা যখন ইহরাম বাঁধবে, তখন তাদের মোযা কেটে জুতা বানিয়ে নিবে। কিন্তু সাফিয়্যা বিনতে আবী উবায়দ তাকে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার একটি রিওয়ায়ত শুনান। যাতে তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সময় নারীদেরকে মোযা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন ইবনে উমর তাঁর ফতওয়া ফিরিয়ে নেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল কিতাবুল মানাসিক আল কাবীর-এ মুজাহিদের একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। তা এরূপ ঃ

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, আমর ইবনে যুবায়রের এ ফতওয়া শুনে অবাক লাগে যে, হজ্জ আদায়কারী নারীদের চার আংগুল চুল কাটাতে হবে। অথচ তাদের কেবল কোনো দিকের সামান্য গোছা কাটানোই যথেষ্ট।

ইবনে ইসহাক বলেন, একবার বারাআ উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি উমরা করেন এবং তিনটিই যুলকাদা মাসে করেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবগত হয়ে বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি উমরা করেন এবং তার মধ্যে সেই উমরাটিও শামিল রয়েছে, যা তিনি বিদায় হজ্জের সাথে আদায় করেছেন।

–(সুনানে বায়হাকী)

আবু আলকামা বর্ণনা করেন, শায়বা ইবনে উসমান (কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক) হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন ! কা'বাঘরের গেলাফ আমাদের কাছে অনেক জমা হয়ে যায়। মানুষ অপবিত্র অবস্থায় সেগুলো ব্যবহার করতে পারে সেই আশংকায় আমরা গভীর গর্ত খনন করে সেগুলো পুঁতে ফেলছি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তুমি কাজটি খুব খারাপ করছো। গেলাফ যখন কা'বাঘর থেকে উন্মোচন করা হয়, তখন তা তোমাদের জন্য অকেজো জিনিস। চাই তা সুস্থ

www.pathagar.com

কেউ পরিধান করুক কিংবা ঋতুবতী পরিধান করুক। সামনের দিকে তোমরা উন্মোচিত গেলাফ বিক্রি করে দিবে এবং বিক্রীত অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিবে।-(সুনানে বায়হাকী)

www.pathagar.com

ক্রয়-বিক্রয়

(ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল)

আবু ইসহাক সুবায়ঈর স্ত্রী বর্ণনা করেন যে, তিনি কয়েকজন মহিলার সাথে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গমন করেন। জনৈকা মহিলা বলেন ঃ

উম্মুল মু'মিনীন ! আমার একটি দাসী ছিলো। আমি তাকে যায়েদ ইবনে আরকামের কাছে আটশত দিরহামে বিক্রি করে দিলাম। কিন্তু তিনি তখন মূল্য পরিশোধ করেননি। বরং বললেন যে, যখন ওযীফার (ভাতা) টাকা পাবো, তখন পরিশোধ করবো। কিছুদিন পর তিনিও ঐ দাসীটিকে বিক্রি করতে চান। আমি জানতে পেরে ছয়শত দিরহাম নগদ দিয়ে আমি ঐ দাসীটিকে তার কাছ থেকে কিনে নিলাম (এভাবে আমার দুইশত দিরহাম মুনাফা হলো)। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা শুনে বললেন ঃ তুমিও অন্যায় করেছো এবং যায়েদও অন্যায় করেছে। যায়েদকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিবে যে, সে যদি তাওবা না করে, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে তিনি জিহাদের যে সওয়াব লাভ করেছেন, তা বাতিল হয়ে যাবে। একথা শুনে ঐ মহিলা বললেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন ! আপনার কথার অর্থ কি এই যে, এখন তার থেকে কেবল দাসীর আসল মূল্য গ্রহণ করার অধিকার আছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আর একথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ـ

"যে ব্যক্তির কাছে তাঁর প্রভুর কাছ থেকে [সুদ সম্পর্কে] উপদেশ এসেছে আর এ উপদেশ শ্রবণ করে সে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হলো, তখন তার খাতক থেকে কেবল সেই পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, যে পরিমাণ প্রথম দিয়েছিলো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

(গ্রন্থকার আবদুর রাযযাক, সুনানে বায়হাকী, সুনানে দারা কুতনী)

www.pathagar.com

বিবাহ

(বিবাহের মাসায়েল)

ইবনে আবী মালাকিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে মুতআ (অস্থায়ী বা অল্পদিন স্থায়ী বিবাহ যা শিয়া মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু সুন্নীগণ তা অসিদ্ধ মনে করেন) সিদ্ধ, না অসিদ্ধ জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন ঃ আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ফায়সালাকারী। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۝

"যেসব লোক তাদের স্ত্রীগণ ও দাসী ছাড়া নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। কিন্তু যারা এছাড়া অন্য কিছু তালাশ করে, তারা অবশ্যই সীমা অতিক্রমকারী।"–(সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি তার বিবাহিতা স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে।–(হাকেম)

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ হাদীসে শা'বীর একটি রিওয়ায়াত বিধৃত করেন। তাতে তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি ফাতেমা বিনতে কায়সের কাছে গেলাম এবং তাকে সেই ফায়সালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যা তার তালাকের মুকাদ্দামা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে আমার স্বামী তালাক দিয়েছিলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার স্বামীকে বলে দিন, সে যেনো তালাকের মুদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার থাকার ও খোরপোশের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দাবী মানলেন না।"

বুখারী ও আবু দাউদে উরওয়ার একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তাতে তিনি বলেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফাতেমা বিনতে কায়সের ওপর কঠোর দোষারোপ করতেন। বলতেন, ফাতেমার ঘর বিজন ও বিরান স্থানে অবস্থিত ছিলো। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।১

---

১. নতুবা ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের দিনগুলো তার স্বামীর গৃহে কাটাবে।–অনুবাদক

www.pathagar.com

ইমাম মুসলিম উরওয়ার একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি বলেন যে, সাঈদ ইবনে আসের পুত্র আবদুর রহমান ইবনে হাকামের কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু পরে তাকে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়। আমি তার এ কাজের প্রতিবাদ করলাম। তখন কেউ কেউ বলতে লাগলো, ফাতেমা বিনতে কায়সও তো তালাকের পর তার স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। উরওয়া বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলাম এবং এসব বৃত্তান্ত তাঁকে খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ ফাতেমা বিনতে কায়সের জন্য এ হাদীস বর্ণনা করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

সমগ্র

(বিবিধ মাসায়েল)

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাই কাসিমের একটি রিওয়ায়াত তাঁর সহীহ হাদীসে লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি বলেন যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে দেখেছেন, সে মস্তবড় পাপ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল জিবরাঈলকে তার আসল আকৃতি ও অবয়বে দেখেছেন। আর এমন অবস্থায় দেখেছেন যে, তার অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের প্রশস্ততাকে পরিবেষ্টন করেছিলো।

ইমাম মুসলিম মাসরূকের একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, উম্মুল মু'মিনীন ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার কথা শুনে তো আমার পশম খাড়া হয়ে গেছে। শোনো ! যে ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

"চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুসমূহ দেখতে পান। তিনি অতি সূক্ষ্ম ও পরিজ্ঞাত।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১০২)

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে দু'বার অবশ্যই দেখেছেন।

ইমাম বুখারী ইবনে মালাকিয়ার একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

একবার ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا -

আমি (ইবনে মালাকিয়া) উরওয়া ইবনে যুবায়রের সাথে মিলিত হলাম এবং তাকে বললাম, ইবনে আব্বাস كُذِبُوْا -এর 'যাল'কে তাশদীদ ছাড়া পাঠ

www.pathagar.com

করেন।১ তিনি বললেন ঃ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সামনেও একবার এ প্রশ্ন পেশ করা হয়েছিলো। তাঁকে বলা হয়েছিলো যে, এ আয়াতের কিরাআত كُذِّبُوا নয়, বরং كُذِبُوا । তিনি একথা শুনে বলেন ঃ মাআযাল্লাহ আল্লাহ তাআলার রাসূলদের সম্পর্কে এটা ধারণাও করা যায় না যে, তাঁরা কোনো সময় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক কৃত ওয়াদাসমূহকে মিথ্যা মনে করবেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলদের সাথে যে ওয়াদা করেন, রাসূলগণ বিশ্বাস করেন যে, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আয়াতের অর্থ মূলত এই যে, রাসূলদের ওপর এতো মুসীবত নাযিল হয় যে, তাদের এ ধারণা জন্মে যে, তাদের ওপর আপতিত উপর্যুপরি বালা-মুসীবত দেখে তাদের অনুসারীরাই তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করতে থাকবে। তাই তোমরা এ আয়াতে كُذِبُوا -এর 'যাল'কে তাশদীদ-এর সাথে পাঠ করবে (যার অর্থ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা)। তাখফীফ করে পড়বে না (যার অর্থ মিথ্যা ওয়াদা করা)।

তায়ালিসী তাঁর মুসনাদে মাকহূলের একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করতেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অশুভ ব্যাপার তিনটি জিনিসে আছে। ঘর, নারী ও ঘোড়া। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা জেনে বললেন ঃ আবু হুরায়রা পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেননি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়ান করছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা বলছে যে, অশুভ ব্যাপার তিনটি জিনিসে আছে। ঘর, নারী ও ঘোড়ায়। আবু হুরায়রা হাদীসের প্রথম অংশ শুনেননি। শেষ অংশ শুনে রিওয়ায়াত করা শুরু করে দেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে আবু হাসসান আল আরাজের বরাত দিয়ে এ রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নারী, চতুষ্পদ জন্তু ও গৃহে অশুভ রয়েছে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ সেই আল্লাহর কসম ! যিনি আবুল কাসিমের ওপর কুরআন নাযিল করেছেন। প্রকৃত

১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু كُذِبُوا পাঠ করেছিলেন। তখন আয়াতের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যখন রাসূল নিরাশ হলেন এবং তাঁর ধারণা হয় যে, তাঁর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে। আর রাসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীরা একথা বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ?-(অনুবাদক)

www.pathagar.com

কথা তা নয়, যা আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত বলেছিলেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা বলতো যে, নারী, চতুষ্পদ জন্তু ও গৃহে অশুভ হয়ে থাকে। একথা বলে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَءَهَا ـ

"ভূপৃষ্ঠের যে ব্যক্তির ওপরই কোনো বিপদ আসে, তা আমি তার জন্মের পূর্বেই কিতাবে লিখে রেখেছি।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২২)

বাযযায আলকামার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন ঃ একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে বলেন যে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, জনৈকা স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা শুনে বলেন ঃ "ঐ স্ত্রীলোকটি কাফের ছিলো।"

আলকামা আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ একটি হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।–(বাযযায)

এ হাদীসটি কাসেম ইবনে সাবিত সারকিসতী এ ভাষায় বর্ণনা করেন ঃ

আলকামা ইবনে কায়েস বলেন ঃ আমরা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে হাযির হলাম। আমাদের সাথে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আবু হুরায়রাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আবু হুরায়রা ! তুমিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করছো যে, একজন স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রাখতো। সে তাকে নিজে খাবারও দিতো না এবং ছেড়েও দিতো না। যাতে সে কোথাও গিয়ে খাবার খোঁজ করতো। এভাবে সেটি ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা যায়। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপই শুনেছি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে একজন মু'মিনের মর্তবা এর উর্ধে যে, তিনি তাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দিবেন। ঐ স্ত্রীলোকটি তার সাথে সাথে কাফেরও ছিলো। আবু হুরায়রা ! তুমি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস বর্ণনা করবে, তখন ভেবে-চিন্তে বর্ণনা করবে।"

www.pathagar.com

বুখারী ও মুসলিম উরওয়ার বরাত দিয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীরাসের ব্যাপারে উসমান ইবনে আফফানকে দূত বানিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তখন আমি তাদেরকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি একথা বলেননি যে, আমার মালের কোনো ওয়ারিস হবে না। আমার পরিত্যক্ত সম্পদ সদকা হবে।

আবু আরূবা আর হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আল হারাবী ও আবু মনসুর বাগদাদী কালবী থেকে রিওয়ায়াত করেন ঃ একবার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তির পেট বমি ও রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তা এর চেয়ে উত্তম যে, তার পেট শে'র বা কবিতা দ্বারা পূর্ণ হবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন একথা শুনতে পেলেন, তখন বললেন, আবু হুরায়রার পূর্ণ হাদীস স্মরণ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত বলেছিলেন, কোনো ব্যক্তির পেট বমি ও রক্ত দ্বারা পূর্ণ হওয়া এর চেয়ে উত্তম যে, তার পেট আমার কুৎসাপূর্ণ কবিতা দ্বারা পূর্ণ হবে।

উরওয়া বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ হাদীসটি সম্বন্ধযুক্ত করেন যে, যদি আল্লাহর তরফ থেকে আমি একটি চাবুকও পাই, তবে তা আমার কাছে কোনো অবৈধ সন্তান আযাদ করার চেয়ে অধিক পসন্দনীয়। আর এ জারজ সন্তান তিনজনের মধ্যে (মা, বাপ ও শিশু) নিকৃষ্টতম। আর মৃতকে তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে আযাব দেয়া হবে। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আবু হুরায়রার উপর রহম করুন। তিনি ভালোভাবে শুনেননি। তাই ভালোভাবে বর্ণনাও করেননি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔

"সে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আর তোমার জানা উচিত যে, ঘাঁটি কী ? কোনো গোলাম আযাদ করা।"–(সূরা আল বালাদ ঃ ১১-১২)

তখন সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, আমরা দরিদ্র। আমাদের কাছে আযাদ করার মতো দাসদাসী কোথায় ? কারো কারো কাছে হাবশী ক্রীতদাসী থাকে, যারা ঘরের কামকাজ করে দেয়। আপনি পসন্দ করলে তাদেরকে বাইরে ব্যবহার করার অনুমতি দিন। ফলে তাদের থেকে যে সন্তান জন্ম নিবে,

www.pathagar.com

তাদেরকে আমরা আল্লাহর আহকাম অনুসরণে আযাদ করে দেবো। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমাকে যদি আল্লাহর পথে কেবল একটি কোড়াও দেয়া হয়, তা আমার কাছে ব্যভিচারের দরুন জন্ম নেয়া সন্তান আযাদ করার চেয়ে অনেক পসন্দনীয়। আর আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, জারজ সন্তান তিনটি মন্দ বস্তুর অন্যতম, প্রকৃত ঘটনা এরূপ নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মদীনায় এক মুনাফিক ছিলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন রকম কষ্ট দিতো। একবার তিনি তার কথা উল্লেখ করলেন। কেউ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ তিন জিনিস ছাড়া সে জারজ সন্তানও। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে তিনটির মধ্যে নিকৃষ্টতম। অর্থাৎ তার মা-বাপের চেয়েও বেশী খারাপ। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তো বলেন ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى –কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় হাদীস এ বর্ণনা করেন যে, মৃতকে তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের দরুন আযাব দেয়া হবে। এ হাদীসটিও এরূপ নয়। বরং প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ইহুদীর ঘরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। সে মারা গিয়েছিলো। তার পরিবারবর্গ বিলাপ করছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে অথচ কবরে তাকে আযাব দেয়া হচ্ছে। একজনের ক্রন্দনের দরুন আরেকজনের কিভাবে আযাব হতে পারে ? যেখানে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলছেন ঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا –আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবনে উমরের এ রিওয়ায়াত তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বেলাল রাতে আযান দেয়। তাই রোযাদার লোক তার আযানের সময় রীতিমতো সাহরী খাবে। অবশ্য যখন ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দিবে, তখন খানাপিনা বন্ধ করে দিবে। কিন্তু বায়হাকী উরওয়ার বরাত দিয়ে এর বিপরীত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন। আর তা হচ্ছে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ লোক। তাই সে যখন আযান দিবে, তখন রীতিমতো সাহরী খেতে থাকবে। কিন্তু বেলাল তখন পর্যন্ত আযান দেয় না, যে পর্যন্ত স্বয়ং নিজের চোখে উষা হতে না দেখে। সুতরাং বেলাল যখন আযান দিবে, তখন খানাপিনা বন্ধ করে দিবে।

www.pathagar.com

এ রিওয়ায়াতে এও উল্লেখ আছে যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ ইবনে উমর ভুল বলছেন। আবু দাউদ ছাড়া সিহার অন্য পাঁচটি কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাতের গোশত আনা হলে তিনি তা মজা করে খান।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম তিরমিযী হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"হাতের গোশত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশী পসন্দ করতেন না। কিন্তু যেহেতু সে সময় গোশত খুব কম পাওয়া যেতো এবং হাতের গোশত খুব তাড়াতাড়ি গলে যেতো, তাই তিনি তা ভক্ষণ করতেন।"

তিরমিযী শরীফে আবু রাযীন থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের কাছে এসে আপন হাত কপালের ওপর রাখেন এবং বলেন ঃ

তোমাদের কেউ কেউ মনে করে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সঠিকভাবে বর্ণনা করি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে একথা শুনেছি যে, যদি কোনো ব্যক্তির জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তবে যে পর্যন্ত তা ঠিক না করবে এক জুতায় হাঁটাচলা করবে না।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তিনি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য একটি মোযা পরিধান করে হাঁটতে আরম্ভ করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com